দ্বিতীয় অধ্যায়

শেখর দাশের সাহিত্যব্যক্তিত্ব : 'শতক্রতু' পর্যায়

বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক গল্পকার, কবি— তাদের বলিষ্ঠ দক্ষতায় সাহিত্যব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যাচ্ছেন। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়ে নয়, সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের নিরিখেও লিটল ম্যাগাজিন বরাক উপত্যকায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বরাক উপত্যকার স্থান-কাল, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, লোকায়ত জীবনচর্যা সবই লিটল ম্যাগাজিনের ধারক ও বাহক। প্রধান প্রধান লিটল ম্যাগাজিনের আঙ্গিক প্রকরণের বৈচিত্র্যে এই অঞ্চল কাব্য-চর্চা কিংবা গল্পভাষা ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। লিটল ম্যাগাজিনই কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, প্রবন্ধকারদের শক্তিশালী সমৃদ্ধিময় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছিল বলেই আমরা কাব্য-গদ্য প্রবন্ধের বর্ণচ্ছটায় নিজেদের রঞ্জিত করতে পারি। প্রকৃত অর্থে যারা অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাদের কৃতার্থ ও রসবোধ চরিতার্থ একমাত্র ছোটপত্রিকাই করতে পারে। সময় ও জীবনের কাছে দায়বদ্ধতা পালন করার জন্য প্রাণের তাগিদে ঐতিহাসিক ভূমিকা নেয় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন। বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যে ছোট পত্রিকার জয়যাত্রা এবং সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বরাক উপত্যকায় সাহিত্য-চর্চা এবং আধুনিকতার ক্রম-বিবর্তন ছোট পত্রিকার সূত্রেই সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলে নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত অনেক ছোট পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই এখানকার সাহিত্যিক জমি কর্ষিত হয়ে আসছে। অনেক সাহিত্য পত্রিকা উদিত হচ্ছে এবং মূলত অর্থনৈতিক, ভারসাম্যহীনতার কারণে আবার বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে

পর্যায়ক্রমে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে যাচ্ছে। তবু এর প্রকৃত মূল্যায়ন প্রয়োজন। একথা আমরা বলতে পারি যেখানে জীবন প্রবাহ কঠিন, যোগসূত্রের একান্ত, শত অভাব তার মধ্যে লক্ষ্য যতই উচ্চ হোক না কেন স্বাভাবিক কারণেই তা বিলীন হয়ে যায় জলের বুদবুদের মতো। কিন্তু সময় মানুষকে তৈরি করে নেয়। আজ আমরা সাহিত্য জগতে যে প্রতিষ্ঠিত উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাই তাঁদের প্রায় সবারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে। বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় কোন গল্পকার, প্রাবন্ধিক বা কবিকে যদি আমরা সঠিক অর্থে মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে এখানকার আঞ্চলিক লিটল ম্যাগাজিনকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্যমুখী বোধ, হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাকে তুলে আনা এবং প্রকৃত পাঠককে আবিষ্কার করা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের মূল দায়িত্ব থেকে থাকে। কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, প্রকাশনার ও পর্যাপ্ত প্রকাশের সমস্যা রসজ্ঞ পাঠকের অভাবে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে ওঠে না। তাছাড়াও সমাজের কূটনৈতিক ধূর্ত অসামাজিক মানুষের দায়িত্ববোধহীনতাও লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্যকে সঠিক অর্থে বিকশিত হতে বাধা দেয়। এই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বরাক উপত্যকার লিটল ম্যাগাজিনগুলি নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে বলে আমরা মনে করি।

আর লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ও পাঠক কিরকম হবে তাদের আকরণ 'শতক্রতু'র সম্পাদকীয় লেখায় স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে—

"লিটল ম্যাগাজিনের লেখক সদা সর্বদা ভিন্নতর
আঙ্গিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত

থাকেন, অন্য কিছুতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ... লিটল ম্যাগাজিনের গদ্যপাদ্য তাবৎ লেখাজোখা প্রায় প্রতিসময় প্রচলিত রচনারীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটাতে চায় এবং অবধারিত ভাবে এইসব ঘড়উঁচু বেপরোয়া রচনা কারো পক্ষে শুয়ে বসে, হাই ভাংগতে ভাংগতে কিম্বা দৈনন্দিন ঘর গেরস্থালী সামলাতে সামলাতে কখনও পড়েফেলা সম্ভব নয়। যারা এরকম করে থাকে তাদের পক্ষে লিটল ম্যাগাজিনের রচনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসবাস করাই বাঞ্ছনীয়। লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক একজন ধীরস্থির, সকল সংস্কার বর্জিত অনুসন্ধিৎসু, সদাজাগ্রতচিত্ত, সাহিত্য সমর্পিত প্রাণ মানুষ কিংবা মানুষী।"[১]

সাহিত্য সর্বকালে সত্য, সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ লেখা পাঠকের কাছে তুলে ধরে। কিন্তু কিছু মানুষ বড়ই অসময়ে হায়হায় রব তুলে নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর চক্রান্ত বরাবরই করে থাকে, যা লিটল ম্যাগাজিনের প্রভাব পড়তে বাধ্য। আমরা যদি বরাক উপত্যকার ইতিহাসের দিকে তাকাই দেখব, পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ ছোট পত্রিকা ছিল কবিতা কেন্দ্রিক। বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিজস্ব স্থান তৈরি করেছিল ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে। ছোট পত্রিকা 'সম্ভার' ১৯৫৭ সালে পূজো সংখ্যায় অমিতকুমার নাগ ও অতীন্দ্রমোহন গুপ্তের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'সম্ভার'-এর হাত ধরে এই অঞ্চলে গল্পের যে ভিত্তিভূমি তৈরি তা ছিল সীমিত এবং অনিয়মিত। তবুও পাঠক ও সাহিত্য রসিকদের রসতৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য 'অনিশ'-এর আত্মপ্রকাশ। প্রথম এবং একমাত্র গল্প বিষয়ক পত্রিকা 'অনিশ' ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে

আবির্ভূত হয়।

'অনিশ'কে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় গদ্যসচেতনতা এবং অনেক খ্যাতনামা গল্পকার যেমন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, গণেশ দে, করুণাকান্তি দাস, রণবীর পুরকায়স্থ, মিহির কান্তি রায়, জগৎ লাহা সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করেন। 'অনিশ'এর প্রকাশ সাময়িক ভাবে বন্ধ হওয়ার ফলে 'অনিশ'এর লেখকেরা— শ্যামলেন্দু, মিথিলেশ, তপোধীর, রণবীর, অরিজিৎ প্রমুখ গল্পকার তাদের শিল্প ও মনের তাগিদেই এ অঞ্চলে জন্ম নিল বৃহত্তর এক গোষ্ঠীবন্ধ সাহিত্য আন্দোলন। প্রচলিত রীতিপদ্ধতি আঙ্গিকের আন্দোলনে 'অনিশ'এ যা বীজ বপন হয়েছিল বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'শতক্রতু'তে তা অঙ্কুরিত হয়।

১৯৭৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ের রথযাত্রায় ১৩৮০ সনে প্রাণের উদ্দীপনায় আর মনের তাগিদে 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ। সমাজে অক্ষর হীনবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কলা ও সাহিত্যকে বিপন্ন লক্ষ্যচ্যুত করতে সদাই ক্রিয়াশীল। সাহিত্যের বিপন্নতাকে পাশ কাটিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব এসে পড়ে সাহিত্যানুসন্ধিষ্ণু মানুষের কাছে। সম্পাদকদ্বয় ভাস্করানন্দ শর্মা ওরফে তপোধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্য সহজ-সরল সাধারণ জীবন যাপনকে বিসর্জন দিয়ে মনের তাগিদে প্রাণের উদ্দীপনায় জন্ম দিলেন বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'শতক্রতু'র।

'শতক্রতু'তে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও গল্প আন্দোলনই মুখ্যত প্রধান ছিল। 'শতক্রতু'র আবিষ্কার করল বরাক উপত্যকার গল্প ইতিহাসের বলিষ্ঠ গল্পকারদের। শেখর দাশ, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, বিজয় দেব রায়, আশুতোষ দাস, কৃষ্ণা মিশ্র, অনুশ্রী সেন প্রমুখ গল্পকার। বর্তমানে দাঁড়িয়ে ১৯৭৩ সালের 'শতক্রতু'র সঠিত মূল্যায়ণ করা সত্যই মুশকিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা,

পাঠক, পরিবেশ, প্রভাবিত করেছিল 'শতক্রতু'কে। তপোধীর ভট্টাচার্য অন্তরঙ্গ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যেসময়ে 'শতক্রতু' প্রকাশিত হত তখন কিছু লিটল ম্যাগাজিন এবং দেওয়াল লেখা ছাড়া অন্য কোন সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হোত না বললেই চলে। সময়ের তাৎপর্যে 'শতক্রতু'র গল্প পাঠকের কাছে নতুন জানালা উন্মোচন করে বহুস্বরিক ও অসামান্য কথা কাহিনিতে সময়ের মোহর যে কত বিস্ময়কর তা আলাদা ভাবে আমাদের চিনিয়ে দেয়।

তাঁর রচিত গল্পের যে সীমাহীন আকল্প চিত্রপট চিহ্নায়ণের সূত্র পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন তার অন্যতম পুরোধা লিটল ম্যাগাজিন 'শতক্রতু'। সাহিত্যের তাগিদে সামাজিক দায়বদ্ধতায়, স্বল্প পুঁজিপাটা নিয়ে সাহিত্যরূপা অনুর্বর কঠিন শক্ত গদ্য জমিতে স্বপ্নের ফসল উৎপাদনের প্রস্তুতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন, দক্ষ, প্রখর জ্ঞানলব্ধ সম্পাদকদ্বয়, তাঁদের স্বাভাবিক জীবন যাপন বিসর্জন দিয়ে আরাম-শান্তি-লজ্জা বন্ধক রেখে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে সুদে ঋণ নিয়ে প্রবল উৎসাহে পাঠক সমাজের ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলা 'শতক্রতু' সাহিত্য পত্রিকাকে চলিষ্ণুমান করেছিলেন; যা ইতিহাসের পাতায় তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সমাজের কাছে নৈতিক দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে। আর আমরা যদি শেখর দাশের সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে সময়ের নিরিখে মূল্যায়ণ করতে চাই তবে লিটল ম্যাগাজিন 'শতক্রতু'কে কেন্দ্র করেই করতে হবে। সত্তর শতকে এখানকার মানুষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন উন্নত ছিল না কারণ বাঙালির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বিরাজ করছিল রাজনৈতিক ও আধিপত্যবাদের আগ্রাসন। 'শতক্রতু' সাহিত্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাবুলিওয়ালার তাড়া খেয়ে ও ভয়ে নিজের সহজ সরল রাস্তা ত্যাগ করে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন সম্পাদক হওয়ার সুবাদে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব আধুনিক কালে। যদিও ছোটগল্পে

আকরণ অতি প্রাচীনকাল থেকে, মানুষের মনের কল্পনার রং তুলি দিয়ে সাজিয়ে গল্প বলা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আচরণ। উনবিংশ শতাব্দীতে ছোটগল্পের রূপ, প্লট, বয়ান, তাৎপর্য ত্বরান্বিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল ছোটপত্রিকার উদ্ভব। সে পত্রিকা নির্ভর গল্প সম্ভারে অসংখ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গল্প যাত্রার প্রধান ধারক ও বাহক। শিশির কুমার দাশ ছোটগল্পের উৎপত্তি ও গল্প যে পত্রিকা নির্ভর এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> *"এই উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কারণে ছোটগল্পের রূপ ত্বরান্বিত হল তার অন্যতম কারণ হল অসংখ্য পত্রিকার উদ্ভব। সম্ভবত জামার্নীতে এই ধরণের পত্রিকার উদ্ভব ঘটে সর্বপ্রথম অনেকটা আমাদের পূজাবার্ষিকীর মতো। পত্রিকাগুলিই ছোটগল্প রচনার উৎসাহদাতা। জনচিত্তের আকাঙক্ষা বা দাবি অনুসারেই যে বিশেষ বিশেষ রচনার জোঁয়ার-ভাটা একথা নির্মম হলেও সত্য। ... বাংলাদেশেও তার অন্যথা ঘটেনি। পত্রিকার বুকেই ছোটগল্পের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা।"*[২]

প্রতিষ্ঠিত কাব্য আন্দোলন থেকে সরে গদ্য আন্দোলনকে তরান্বিত করার জন্য সম্পাকদ্বয় বার বার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন গল্পকে সমৃদ্ধ করার। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই প্রকাশিত হয় 'শতক্রতু'তে বিশেষত গল্পের দিকে অনুসন্ধিৎসু সম্পাদকদ্বয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। 'শতক্রতু' সম্পাদকীয়তে আছে গল্প জগতে নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন প্রকরণ উন্মোচন একটি সুষ্ঠ শক্তিশালী মননশীল গল্প আন্দোলনই করতে পারে। তাছাড়া আরো আছে—

"কাছাড়ের চারদিকে যখন তুলকালাম কবিতা আন্দোলন চলছে ঠিক সেই সময়ে গদ্য রচনার প্রতি এক ধরণের অহেতুক অনীহা কিম্বা পাশ কাটানো মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই সংগে অক্ষমতার প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। তবে সে সময়ে এমন দু'একজন ক্ষমতাবান গদ্যকার যে ছিলেন না এমন নয়, কিছু কবিতার প্রতি সীমাহীন দুর্বলতাই তাদের উৎকৃষ্ট গদ্য রচনার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এছাড়া অবশ্য আরো দু'চারজন কবিতা রচনার ফাঁকে ফোকরে কিছু কিছু গল্প লিখেছেন কিন্তু সেসব লেখা অত্যন্ত নীচুমানের, যে লেখাগুলোকে আদৌ গল্প বলা যায় না, বলা যায় সাদামাটা বিবরণ। গদ্য রচনার জন্য যে নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন আছে, বোধ করি এ সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না, তাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাছাড়ে কোন উল্লেখ যোগ্য গল্পকারের সন্ধান মিলেনি। ষাটের দশকের গোড়ায় দু'একজন তরুণ গল্পকার আত্মপ্রকাশ করলেন যাদের লেখা পড়ে এটুকু বোঝা গেল আগামীতে কাছাড়ে উৎকৃষ্ট মানের গল্প রচনার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে ফলবান হতে শুরু করলো তখনই যখন আরো দুচারজন বলিষ্ঠ তরুণ গল্পকার গল্পের আসরে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার নিদারুণ অভাব হেতু আজ পর্যন্ত কাছাড়ে একটি সুষ্ঠ,

শক্তিশালী গল্প আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারলো না। একথা এখানে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় যদি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব দূর হয় তাহলে আগামী দশ বছরের ভিতর কাছাড়ে গল্পের ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যাবে, কবিতার ব্যাপারে আজ কাছাড় যেরূপ অভিনন্দিত, গল্পের ব্যাপারে ঠিক সেরূপ অভিনন্দিত হবে।"[৩]

'শতক্রতু' সাহিত্য পত্রিকা শিলচরের গল্পের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করেছিল। লক্ষ্য উচ্চ থাকলে যেমন শতবাধা বিপত্তি লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না, গন্তব্যের অভিযাত্রা থেকে, ঠিক তেমনি ভিতরে-বাহিরে ক্ষতবিক্ষতে জর্জরিত কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের সৌজন্যে আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারিয়ে, কবিতার ব্যাপারে কাছাড় যেরূপ অভিনন্দিত গল্পের ব্যাপারে ঠিক সেরূপ অভিনন্দিত নয়।

বরাক উপত্যকায় কবিতায় সীমাহীন দুর্বলতার জন্য উৎকৃষ্ট গদ্য রচনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গদ্যকার নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। উত্তাল রাজনৈতিক ধারাবাহিক জীবনের প্রতিকূলতা, বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য জগতের সাথে যোগাযোগ তা প্রত্যোৎসাহের অভাবের জন্য গদ্য রচনায় যে নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন— তা গদ্যকার সামগ্রিক ভাবে আত্মনিয়োজিত করতে পারেনি। যেখানে সাহিত্যের কেন্দ্র-ভূমি ছত্রছায়া ও সহযোগিতার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রবল উদাসীনতার জন্য এ অঞ্চল, উপেক্ষিত। ফলে বাংলা গদ্যে সাহিত্যে সূর্য উদয় হতে একটু বিলম্ব হলো। এখানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিল 'শতক্রতু' সাহিত্য পত্রিকা। যদিও আমরা 'সম্ভার', 'অনিশ' সাহিত্য

পত্রিকায় বাংলা গদ্য সাহিত্য আন্দোলনের বীজ বপন করতে দেখেছি। কিন্তু তা উৎকৃষ্ট রূপে প্রাণ পেলো 'শতক্রতু'তে এসে, সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা।

'শতক্রতু' সাহিত্য পত্রিকার বুকে বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের গতি পরিবর্তন, আধুনিকতার সুর, অস্থির-অনিশ্চিত সময়ের বাক্যালাপ আমরা দেখি। 'সম্ভার' থেকে 'অনিশ', 'অনিশ থেকে 'শতক্রতু' বাংলা গল্প রচনায় উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক। আর 'শতক্রতু' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষীণ গতিতে বয়ে চলা। বরাক উপত্যকার সাহিত্য স্রোতকে তরান্বিত করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

> *"... তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, সমগ্র আসাম বা পুরাঞ্চল জুড়ে একটি বিস্তৃত সুষ্ট গদ্য আন্দোলন গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে কোনো পরশ্রীকাতর লাল চক্ষুকে আমরা পরোয়া করি না। প্রয়োজন হলে সম্মুখ যুদ্ধে তার টুঁটি টিপে ধরতে আমরা একটুমাত্র বিলম্ব করবো না।"*[৪]

১৩৮৮ সালে চৈত্র মাসে 'শতক্রতু' ২৫তম সংখ্যাটির প্রকাশকালে ঐ সংখ্যাটিতে বিজ্ঞাপন হিসাবে উল্লেখ আছে যে,

> *"শতক্রতু ২৬*
> *বেরোবে সেপ্টেম্বরে*
> *দুর্দ্ধর্ষ প্রবন্ধ, দুর্দান্ত গল্প, দোর্দণ্ড আলোচনা নিয়ে*
> *দ্যাখ, পাঠক*
> *শতক্রতুর সঙ্গে তুলনীয় শুধু শতক্রতু-ই"*[৫]

২৬তম সংখ্যাটি পরে প্রকাশিত হয় এবং এই পর্যায়ের এটিই সর্বশেষ সংখ্যা। অর্থাৎ ১৩৮৮ সাল (১৯৮১ খ্রিঃ) পর্যন্ত 'শতক্রতু' ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তার উপরে পাঠকের অভাব ও পত্রিকাটির প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, আধুনিকতার চূড়ান্তে পৌঁছেও যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। তখনকার যুগে সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যেখানে নড়বড়ে সেখানে পাঠকের সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা কয়েকজন। আর একথা বলতে দ্বিধা নেই যা ছোট সাহিত্য পত্রিকা অনিয়মিত ও একেবারে বন্ধ হবার প্রধান কারণ বলে আমরা মনে করি।

সাহিত্য জগতের সঙ্গে লেখকের যেমন নিবিড় সম্পর্ক, তেমনি লেখকের সাথে পাঠকের। দুর্ভাগ্যবশত এই উপত্যকার সাহিত্যপ্রেমীদের শত চেষ্টার ফলেও সত্যিকারের পাঠকে তৈরি হয়নি। সময় নিষ্ঠা, অর্থ ব্যয় করা হয় যাদের জন্য এত যুদ্ধ, এত আন্দোলন তারাই জেগে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাঠকের অভাব সত্ত্বেও এই উপত্যকায় প্রবল উৎসাহে ম্যাগাজিনের জন্ম যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি অকাল মৃত্যুও তাড়াতাড়ি হয়েছে। যদি আমরা ইতিহাসের পাতার দিকে তাকাই তাহলে অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, শতচেষ্টার ফলেও শুধুমাত্র যে পাঠকের অভাবেই ছোট পত্রিকা ক্ষণ আয়ু। সেই ঝড় 'শতক্রতু' সাহিত্য পত্রিকার উপর দিয়েও বয়ে গেছে। সাহিত্যের টানে, সমাজের টানে যাদের জন্য রক্তঝরা লেখা তাদের কাছে শতক্রতুর জোরালো আবেদন—

"পাঠক, তোমাকে,

তুমি কি এখনো অবহেলায়, উদাসীন মুখ
ঘুরিয়ে আছো দিগন্তের দিকে? এবার ফিরে

তাকানোর সময় হয়েছে তোমার, তুমি ফিরে তাকাও, দেখো, রাতের পর রাত জেগে আমরা কলমের নিব আমূল বিদ্ধ করছি আমাদের পাঁজরওলা শীর্ণ বুকে, রক্তের কালিতে তোমার আশা-আকাক্ষা ঢেলে সাজানোয় আমরা কেমন ক্লান্তিহীন! তোমার কাছে আমাদের ঢের পাওয়া ইতিমধ্যে জমা হয়ে গেছে এবার ঋণ পরিশোধ করো। আমরা আমাদের কথা রাখবো, তোমার ভবিষ্যতকে সাজিয়ে দেবো স্বপ্নের বাগান থেকে তুলে এনে কাঁটাহীন গোলাপ দিয়ে। তবু তুমি কি অবহেলায়, উদাসীন মুখ ফিরিয়ে রাখবে দিগন্তের পরপারে। শুধু তাই প্রকাশিত সংখ্যায় আগামী সংখ্যার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকের মনে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসার বীজ বপন করতে সদাই প্রয়াস করে গেছে 'শতক্রতু'।"[৬]

আবার আমরা জানি—

শতক্রতু-২
বিশেষ গল্প সংকলন
বেরুচ্ছে
মধ্য আশ্বিনে
এই সংখ্যার অন্যতম
আকর্ষণ
গল্পকারদের আত্মপরিচিতি।"[৭]

অন্যান্য লিটিল ম্যাগাজিন এর জনপ্রিয়তা ও পাঠকচিত্তে ক্ষীণ আলো

জ্বালানোর প্রয়াস ও এই ম্যাগাজিন বরাবরই করে গেছে।

"লিটল ম্যাগ ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই;"[৮]

সাহিত্যের তাগিদে, অক্ষরকর্মীদের সৃষ্টি চেতনার— উদ্ভাসন জাগাতে, ধীমান পাঠকদের তৃপ্ত করতে নবপর্যায়ে 'শতক্রতু' অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হলো তার সেই দৃঢ়প্রত্যয়ের বাণী সামনে রেখে

"শতক্রতু ছিল, আছে, থাকবে।"[৯]

এই বিশ্ব সংসারে ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, কর্ম-অপকর্ম ব্যাপৃত আছে। তাই সংসারে নিয়ম অনুসারে কর্মের জয়গান অপকর্মে লিপ্ত কতিপয় মানুষ সহ্য করতে পারে না, তা হোক না কেন তাদেরই মঙ্গলের বাণী, তাদেরই আলোর দিশা। 'শতক্রতু' তাদের প্রতি পথ ও পাথেয়ের সন্ধান করে গেছে সোচ্চারভাবে।

"এই অঞ্চলে কিছু ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন থেকে সবিস্ময়ে লক্ষ করছি যে, 'শতক্রতু' ও তার সাহিত্যিক অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার এক সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা সর্বদা ক্রিয়াশীল।"[১০]

এই যুদ্ধ সংগ্রামের দলিল 'শতক্রতু' বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এমন কি নব পর্যায় 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না কারণ ৩৫ বৎসর প্রকাশহীন থাকার পরও আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দে পুনঃপ্রস্তাবনা সংখ্যা লেখক ও পাঠকবর্গের মনে স্বতঃস্ফূর্ততার উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে যা অপরাজেয় যাত্রাপথে নিত্যদিনের পাথেয়।

সত্তর দশকের গল্পকার শেখর দাশের গল্পবীক্ষা ও তার গল্পবয়ানকে বুঝতে হলে, বৃহত্তর বাঙলা সাহিত্যের পূর্ব ইতিহাস আমাদের একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ষাটের দশকে উত্তাল রাজনৈতিক আবহাওয়া দেশ বিভক্ত মানুষের অস্তিত্বের বিশ্বাস ভূমি বড় নড়বরে হতাশা আর আর্তনাদের হাহাকার লেখকের লেখনীর ভাব ও ভাষা পাল্টে যেতে শুরু করল। দেশভাগ জীবনের চরম ব্যর্থতা নোংরা রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক পাশাখেলা অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভাবধারাও পুরোপুরি পাল্টে যায়। ষাটের দশকে বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের মূলধারা সাহিত্যচিন্তা ও তত্ত্বকে অস্বীকার করে শুরু হয় 'শুদ্ধ গল্প' বা 'গল্পহীন গল্প' আন্দোলন। সেখানে হয়তো আমরা কোন গল্প বা কাহিনি পাব কিন্তু গল্প-কাহিনির প্লট, চরিত্র কোনটাই প্রাধান্য থাকবে না। আমরা গল্পের থিম খুঁজলে যে কাহিনি বা চরিত্রকে দেখতে পাই সেটা মুখ্য নয়, গল্পকার কিভাবে গল্পটা লিখছেন সেটাই মুখ্য। এর আগের দশকে বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রেরণায় দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রাম ভেঙে শহর গড়ে উঠা, পুরনো মূল্যবোধ হারিয়ে অস্থির মানব চৈতন্য গল্পের মধ্যে উঠে এল। আধুনিক মানুষের পারিপার্শ্বিকের জীবনযাত্রার সংকটস্থল অস্তিত্বের বিপন্নবোধ, পুরোনো মূল্যবোধ হারিয়ে মানব-চৈতন্য খুঁজে ফিরছিলো নতুন স্বপ্নের আশ্রয়, অথচ সেই আশ্রয় ধরা ছোঁয়ার বাইরে যেতে লাগল। এরই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট তিনটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই বিশিষ্ট তিনটি আন্দোলন হলো : ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'শ্রুতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শ্রুতি আন্দোলন, ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিলে 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকাকে নির্ভর করে হাংরি আন্দোলন এবং ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে মার্চে 'এই দশক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য আন্দোলন। তার মধ্যে 'শ্রুতি আন্দোলন'

শুধুমাত্র কবিতাকেন্দ্রিক, 'হাংরি আন্দোলন' 'কবিতা' ও 'গল্প কেন্দ্রিক' এবং শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য আন্দোলন একান্তই গল্প নির্ভর।

এই বিশিষ্ট তিনটি আন্দোলনই বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোন ব্যক্তিগত প্রয়াস বা কোন বিচ্ছিন্ন কারণে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ইতিহাসের চরম আন্দোলনের পরিণতি এইসব আন্দোলনের মূলভিত্তি ছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ জাতীয় জনজীবনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা করে। মুক্ত স্বাধীন জীবন আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দীপক হিসাবে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন ও শোষণমুক্তির সংগ্রামের চিরন্তন প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। ষাটের দশকের লেখকেরা স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে শৈশব অতিবাহিত করেছে ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ উচ্ছ্বাস প্রাণ উৎসর্গে প্রাণিত হবার বয়স তাদের হয়নি। তাঁদের যৌবন দেখেছে জীবনের অস্থির সময়ের ছবি, ছিন্নমূল মানুষের পরিণতি, খাদ্য বাসস্থানের হাহাকার, মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু ইতিহাস। ফলে হতাশা-নৈরাশ্য অসহায়বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্ন যুগের যন্ত্রণা, পণ্যায়ণ সর্বগ্রামের আত্মকেন্দ্রিক অর্থ সর্বস্ব সুবিধাবাদী প্রজন্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবেগ ও স্বপ্নের অবকাশ পায়নি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম চাহিদা পূর্ণকরা যা অক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্বের চেতনায় পৌঁছতে পারেনি। ফলে সম্পর্ক, শিল্প সত্য সব কিছু স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণের ক্ষমতা, সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার অসহায়বোধ ষাটের দশকের প্রজন্মকে তেজি করে তুলল। বাইরের সভ্যতার দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মমগ্ন হলো নিজের অস্তিত্বে, নিজের ভিতরে। সেখানে শুধু অন্বেষণ নিমগ্ন হয়ে নিজের সাথে নিজে কথা বলা। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও পণ্যায়ণমুখী প্রাতিষ্ঠানিকতার চাপে সময় ও সমাজের আলো-আঁধারি এবং অন্ধকারের কানাগলিতে মানুষের

গল্পের ছাঁচ বদলে যেতে বাধ্য হলো। সমালোচক জানিয়েছেন—

> *"সময় ও সমাজের আলো-আঁধারি প্রচ্ছায়া ও কৃষ্ণবিবরের প্রতি স্বাধীন অভিমতের পৌরুষে ও সাহসিকতায় তর্জনি সংকেত করার বদলে "হাসতে হাসতে হাঁস হলো"র ধরণে নিজেই হয়ে দাঁড়াল বিদুষণ প্রক্রিয়ার দিগন্তরূপ। ষাটের দশকেই দেখা গেল আরো এক ধরণের বিপ্রতীপ প্রক্রিয়া। 'শুদ্ধ গল্প' বা 'গল্পহীন গল্প' এর বার্তা নিয়ে অর্ন্তবস্তুকে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জনের তাগিদে দেখা দিল, উৎকট প্রকরণ-সর্বস্বতা। পাতিবুর্জোয়া বৌদ্ধিক চর্যার এ আরেক নব্যসন্ধ্যা ভাষার ক্রব্যূহ। মুখ্যত 'এই দশক' এবং গৌণত 'ঈগল' 'স্ববান্তর', 'ক্রান্তিক', 'প্রত্যয়', 'আত্মপ্রকাশ' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক গল্পকার আরেক ধরণের নৈরাত্মসিদ্ধির আকল্প নিয়ে এলেন।"*[১১]

আরেক ধরনের নৈরাশ্যসিদ্ধির আকল্প নিয়েই ১৯৭৩ সালে আষাঢ়ের রথযাত্রায় প্রস্তাবনা সংখ্যায় 'ক্রমশ তাপ' গল্পে শেখর দাশ তার গল্পের বিষয় বর্জন করে বিষয়ীর ওপর জোর দিলেন। বর্হিমুখী বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করে নিজের অস্তিত্বে, নিজের ভেতরের অন্বেষণে নিমগ্ন হলেন। তাই আমরা তাঁর গল্পে আকরণের বিনির্মাণ, নিজস্ব শব্দে, বাক্যে শুধুই নিজের মতন করে দেখালেন সদ্য যৌবনে পা রেখে হিলু তার বাস্তব নিজের মতো করে অন্তর-জীবনের উপলব্ধিকে । পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী পৌর সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর প্রতি গল্পকারের গল্পবীজ অন্যদিকে সময়ের পরিসরে বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গল্পবীক্ষা

অনুসরণ করছেন। সময় ও সমাজের প্রতিনিয়ত ভাঙ্গাচোরায় গল্পের ভাষার মধ্যে এক ধরণের সচেতন বিদ্রোহ ব্যক্ত হলো— যা প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যশৈলীতে পাঠকের ভিত্ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিল। গল্পের ভাষা ও চিন্তনকে অনেকেই অশ্লীল বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু যে কোন সাহিত্যের মূল্যায়ণ কতকগুলি চিরাচরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে না। প্রতিষ্ঠিত শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে লেখকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তার বিপন্ন, অস্থির যুগযন্ত্রণা। যা বাস্তব বা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবচেতন মনের লেখক যেন ভিন্নব্যক্তি। গল্পের নায়ক হিলু তরতাজা যুবক৷ যার চোখে স্বপ্ন-কল্পনা ভাবনাজগৎ মিলেমিশে এক অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছে। বয়সন্ধি কালে মানুষের মন ও মুখ যে রকম হয়— কল্পনা, ভাবনা, স্বপ্ন মননে চিন্তায় বাস্তব ও অবাস্তব পরস্পর সম্পৃক্ত। গল্পের নায়কের চরিত্র মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিকার ব্যাখ্যান আকরণ পরিশীলিত৷ গল্পকার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের 'হিলু' নামকরণ করে প্রতীকি ব্যঞ্জনায় গল্পের ভিত্ রচনা করেছেন।

'হিলুয়েশন' থেকে হিলু মানে মনোবিকার, জ্বরের ঘোরে সদ্য যৌবনে সবকিছুতে সমরূপ, দক্ষতার চিহ্ন পরিলক্ষিত৷ গল্পকার কঠিন বাস্তব মাটিতে শব্দের উচ্চবাচনিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনবোধের প্রকরণ। আর গল্পটি শুরু হয়েছে পরাবাস্তববাদের আকরণ দিয়ে। বাস্তব আর পরাবাস্তব তত্ত্বে হিলুর ভাবনা ও জীবনবোধ যেন মিলেমিশে একাকার। প্রাচীন প্রথাকে যৌবনের স্বভাবসিদ্ধরূপেই সম্পূর্ণ নিজস্ব উপলব্ধিতে নতুন করে খুঁজে ফিরেছেন—

"জল বৃষ্টির জল অনেক প্রাচীন।
নিজেই নতুন করে শুনতে হয়।"[১২]

হিলুর ভাবনাজগৎ ক্ষণিকের জন্য জ্বরের ঘোরে ভাবনাবিশ্বে বিচরণ

করেছে অল্পক্ষণের জন্যেই কারণ পরাবাস্তব দীর্ঘস্থায়ী হয় না, পরক্ষণেই বাস্তবে ফিরে আসতে হয়। স্বামী-স্ত্রী, সুধী আর ছাব্বিশ বয়সের বিধবা ছোটদি তার ভাবনা জগতে এক৷ বাস্তব আর পরাবাস্তবের নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থনায় একটা সমকালীন সমাজের রূপকে গল্পকার উৎকৃষ্ট রূপে পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। গল্পভাষা-গল্পবীক্ষায় রাজনৈতিক অবচেতনার প্রচ্ছায়া সক্রিয় চিহ্নের আভাস আমরা পাই —

> *"কচিপাতা পুড়ে যাওয়ার গন্ধা ... বা শরীর থেকে যদি কয়েক ফোঁটা দুঃখী মদের মত ঘাম বেরিয়ে পড়তো তবে কচি তামাক পাতা-গুলো হাবার মত জ্বলার জন্য তৈরী হত না।"*[১৩]

লেখকের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজের দ্বিবাচনিকতায় তৎকালীন সমাজের বিকৃতি জীবনবোধ অবক্ষয়ী পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক দহনে জর্জরিত চিত্রকল্প। জীবন অফুরন্ত আশাবাদী কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা নেতিবাচক দায়দায়িত্বের উর্ধে সমাজ সত্তার গভীরে লুকিয়ে রেখে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন লেখক সত্তার বিনির্মাণ। 'শতক্রতু'তে প্রকাশিত 'শ্বেত রক্তকণা' গল্পে গল্পকার জীবনের অনেক মুহূর্তেই মানুষের সমঝোতার মধ্যে অতিবাহিত প্রতিচ্ছবি রূপরেখা। ভঙ্গুর সমাজে দাঁড়িয়ে অস্থির ইতিহাসের গভীর বুদ্ধিমত্তা থেকে তুলে এনে নবায়মান মূল্যবোধ নির্মাণের প্রকল্পনার সার্থক প্রয়োগ লেখকের স্বপ্নই হয়ে উঠল গভীরতর বাস্তব। রবীন্দ্রনাথের সেই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা শেখর দাশের হাতে ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই, তা কখনও উদাহরণ হয় না। গল্পকারের ভাষা, চরিত্র, প্লট প্রচলিত নিয়ম থেকে ভিন্ন। এখানে গাড়ী ও ড্রাইভারের দ্বিবাচনিকতায় গাড়ী একটি চরিত্র— আধুনিকতার অস্তিত্ব-সংকটের মধ্যে যান্ত্রিক

ও মানবের অর্ন্তনাট্য ও বর্হিবৃত অভিজ্ঞতার সংঘাতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সময়-আয়তনের সূক্ষ্মতর স্তরবিন্যাসকে সূচিত করে।

*"জলে কোথাও আঁচড় কাটা ঠিক না। তাই **WBC** এর রেডিয়াটারের সূক্ষ্ম জালিগুলোর অন্ধকারের বয়স, নিজের বয়স, গাড়ীরও, খুঁজতে থাকো তাই নাম্বার প্লেটে রাশ রাশ কর্মব্যস্ত ধুলো ..."*[১৪]

শিল্প ইতিহাসের আধুনিক চেতনার উপলব্ধি ও মানবিক সত্তার অগ্রগতিতে মানুষের নিঃশব্দ যন্ত্রণা-দহন বাস্তবের পোড়োজমিতে লক্ষ্য করেছিলেন অত্যাচারের মাত্রা। পৃথিবীর গভীর অসুখ উপলব্ধি করে যত নিগরে নেওয়া হচ্ছে আস্তিক্যবোধ, তত বিমূর্তায়িত হয়ে উঠছে বাস্তব আর স্বাভাবিক জগৎকে উপেক্ষা করার মানসিকতা। এই ভিন্নমুখী অবস্থানেই বহুস্বরিক এটাই তাঁর অভীষ্ট।

"কালো জমিতে সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা আছে সবকিছু পরিচয়।"[১৫]

সময়ের অগ্রগতির প্রকৃত তাৎপর্য মানুষের অস্তিত্বের অনালোকিত দ্যুতিময় বিচ্ছুরণ অবচেতন মনে সার্থক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সত্যবোধের নতুন তাৎপর্য অন্বেষণ করে; উন্মোচন করে নিবিড় আত্মমগ্নতার সন্ধান।

শেখর দাশের 'খেলার ঘর' গল্পে পরাবাস্তব আর গল্পহীন গল্পের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্যণীয়। নামকরণেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে একটা ফাঁকা জায়গা মানুষ সংসারের ভিতর ও বাহিরে 'খেলার ঘরের' শুধু খেলার তোড়জোর করে। অর্ধসুপ্ত- অর্ধজাগ্রত অবস্থার প্রকল্পনাকে গল্পকার মূর্ত করে তুলেছিলেন নানা প্রকার বাচনে—

"ঐ মাঠে খেলা চলছে। বিরাট মাঠ। অনেক রাস্তা

আছে ছুটে যেতে সেখানে। ছোট রাস্তা। বড় রাস্তা।
সাদা কালো বহুরাঙা। পাথর ছড়ানোর পথও
আছে।"[১৬]

খাপছাড়া অর্থবাহুল্য গল্পের প্লট পরিবর্তন হচ্ছে— জীবনখেলায় কত রং, কত ঢং সব মিলেমিশে সব কিছু যেন কিম্ভূতকিমাকার। বর্তমান অস্থির অতীত বন্ধ্যা ও ভবিষ্যৎ মরীচিকা নৈরাশ্যে মননে ও বাচনে কোনো মূল্য অনুভব করেন না। তাই ক্রমশ বদলে গেছে তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও চিন্তাভাবনার পরিসর। আর্থসামাজিক ও আধুনিক যুগের অসহায় বন্দিত্বের প্রেক্ষাপটে দ্রুত পট পরিবর্তন ব্যক্তিমানুষকে ক্রমশ অসহায় করে তুলেছিল। গল্পকারের গল্পে বিষয়বস্তুর অবচেতন মনে রূপকল্পনাকে অর্ন্তমুর্খী মন্ময়তার মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠতে দেখি।

মানুষ জীবনের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শখ আর জিজ্ঞাসায় শুধু হয় পথ চলা— দেখা বা জানা জিনিসকে নতুন করে দেখা প্রবৃত্তি নিয়ে খেলার মাঠে নেমেছে। 'গল্পহীন গল্পে' অন্যমাত্রা সংযোজন করে পৃথিবীর সীমাবদ্ধতা বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগকে ছাপিয়ে শেখর দাশের গল্প 'খেলার ঘর' গল্পে সংকেত চিহ্নায়ণে শুধু পাঠকের মস্কিষ্কে নানাবিধ প্রশ্নে ও বিভ্রান্তির বিচিত্র জয়গানই তৈরি করে। বর্তমানে দাঁড়িয়ে গল্পের বিদ্যাসমুদ্র স্বপ্নের ভবিষ্যত দেখার ইচ্ছা ও অস্পষ্ট জটিল নতুন বিশ্ববীক্ষা অনিবার্য করে তুলে। তাই আমরা দেখি—

"আমি এখনই কাঁদিতেছি। অতীতে কাঁদিয়াছি।
ভবিষ্যতে কাঁদিবার ইচ্ছা নাই।"[১৭]

ব্রেঁতো **'Surrealism and Painting'** চিত্রকলার মতো ধরাছোঁয়ার গন্ডি থেকে যেমন ক্রমাগত বাইরে সরে যেতে চায়। ঠিক তেমনই আমরা শেখর দাশের গল্পেও দেখতে পাই জীবনের দার্শনিক উপলব্ধি, তিক্ত ক্ষোভ ও হিংসাত্মক

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম অস্তিত্বের জটিল সন্দিহানে ষাটের দশকের গল্পকারের গল্পের নতুন ভিত। সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার টানাপোড়েন ও যেন গল্পের বাচনে পরাবাস্তবের নিগূঢ় চলচ্ছবি। সাধারণ অনুপুঙ্খের মধ্যে গল্পবস্তু ও গল্প প্রকরণে নতুন নতুন কৌণিকতার যোগ রয়েছে।

জীবনে মানুষ হারিয়ে তাকে খুঁজে মরে সংসারে ভিড়ে অগণিত দ্রষ্টব্য অভাসিত মনের রিক্ত কোণে। বর্হিবৃত বাস্তবতা ও অন্তর্মুখী মন্ময়তার মধ্যে কল্পনানিষ্ণাত বয়ান মানুষের সার্বিক মৃত্যুচেতনার যন্ত্রণা জীবন ও শিল্পে মর্মমূলে গাঢ়তর সময়ের বার্তা বয়ে আনে—

> *"হাতে ওষুধের বাক্সে মরা ওষুধের ইতিহাস দেখলাম— কবুতরের গলার নীল রোদে উঁকি দেয় আমার মৃত সন্তান। আর সিগারেটের বাক্স হাতে করে শহুরে ঝিঁ-ঝিঁর ডাক শুনে হাউ হাউ করে কাঁদে বিদ্যাসমুদ্র;— 'নদীর মন খারাপ রহিল ...' "*[১৮]

'খেলার ঘর' গল্পটি সংকেত গর্ভ ও প্রতীকি ব্যঞ্জনায় মূর্ত। মানুষের জীবনে আবেগ ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী। আমরা কেউ জানি না জীবনের রঙ্গমঞ্চে কী খেলা অংশীদার কিছু খেলার পিছনে সবাই ছুটছি— অর্ন্তসত্তা মৃত্যুচেতনার ইঙ্গিত গল্পে ব্যঞ্জনার দ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

চেতন ও অবচেতনের অর্ন্তবয়নে মনে ও চিন্তাচেতনায় জীবন জগতের পরস্পর সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শেখর দাশের 'ভিক্ষুক' গল্পে অ্যাবসার্ডের ছোঁয়া লেগেছে। বাচনে, ভেতরে ও বাইরে, মায়া ও কায়ায় জীবনের অনুপুঙ্খে, সমকালীন সামাজিক ছবির বিনির্মাণ বিকলাঙ্গ বিধুর কল্পনায়। জগৎ ও সমাজে মাংসদলা বিধুর স্থান অবহেলিত পচন নিঃসঙ্গ তক্তাপোষে। গতিশীল জীবনে

ভারসাম্য হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে প্রকৃতির কোলে। একাকিত্বের বেদনাভার কম করেছে অপরসত্তা। গল্পহীন গল্পে সময়ের প্রতিবেদনে বাস্তবের ভয়ালরূপ লঘু হয়ে যায় গল্পভাষায়।

> *"টুকরো টুকরো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে তখন—*
> *ত্রা-তা গো-গো-আ-মি-মি- মে....। কেউ বোঝে না।*
> *কোন দিন বোঝেনি ওর শব্দগুলো।"*[১৯]

তার নিত্যদিনের সঙ্গী ছোট জানালা আর সেই জানালায় দৃশ্যমান সংকীর্ণ আকাশ, সেই আকাশের কালো মেঘ দেখলে সে ভয় পায়। কারণ মেঘভরা দিনে পুকুরে পা পিছলে সাঁতার না জানা তাঁর দাদা মারা গিয়েছিল। ক্ষুদ্র স্থান, ক্ষুদ্র আকাশ, ক্ষুদ্র ভরসা, ক্ষুদ্র আশা নিয়তি তার কাছ থেকে সহজে ছিনিয়ে নিয়েছিল আশ্রয়ের ছায়া মমতা স্নেহ খালি করে। না ভাষা, না গতি তবুও বিশ্ব সংসারে ভালো থেকে যায় বিধুর মতো ব্যক্তিসত্তা—

> *"দোদারে, আমি ভাল আছি। খুব ভাল আছি, তুই*
> *কেমন আছিস, পুকুরের জলে শ্বাস নিতে তোর কষ্ট*
> *হয়েছিল?"*[২০]

অসহায় বন্দিত্ব সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও অচল, আবদ্ধ গতিহীন সময়ের কান্না নির্মম অমানবিকতায় ফুটে ওঠে বারবার। গল্পের বয়ানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার গভীর তাৎপর্যের নির্যাস। 'নিঃসঙ্গ প্রকৃতিই বিধুকে সঙ্গ দিচ্ছে' প্রকৃতির কুলেই ক্লান্ত পাখিরা আট বছর বিধুর চোখে ঘুম এনে দেয়, প্রজাপতি-জোনাকি মননে ও ভাবনার চিন্তাজগতে নিজস্ব নিবিড় আশ্রয় ভূমিকে খুঁজে নেয়। প্রকৃতির মতো নির্বাক বিধু খুঁজে নেয় আপন আশ্রয় কুৎসিত পরিবেশে শুধু অনর্থক সান্তনার বাণী। অবচেতন মনে রূপকল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে অভিব্যক্ত

করতে চেয়েছেন পরাবাস্তবের দ্যোতনা। গল্পের পাঠকৃতিতে বাস্তব মিশে যাচ্ছে অধিবাস্তবে, আবার অধিবাস্তবই বাস্তব হয়ে উঠে। এই গল্পে আমরা পরাবাস্তববাদী ম্যাক্স এর্নষ্ট অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগ্রত অবস্থার প্রকল্পনার যে দ্যুতি— তা আমরা 'ভিক্ষুক' গল্পে অনুধাবন করি। বাচনে, শিল্পে গল্পের বিষয়ী বাইরে ভেতরে দ্বিবাচনিকতার রূপছটা ভাষায় ধরা পড়ে। জীবন আর মৃত্যুর শাশ্বত রূপরেখার অর্ন্তবয়ান পরিপূর্ণ ও নিটোল আখ্যান। মৃত্যুর পর সোনাভেলায় চড়ে দাদা আর বিধুর দ্বিরালাপের মধ্যে জীবনের আকাঙিক্ষত আশার প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলে। নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে দীঘির শান্ত স্তব্ধ মেঘ যেমন দিক পরিবর্তন করে, শান্ত যখন অশান্ত হয়ে চর্তুদিক ভাসিয়ে নেয় —

> *"অজস্র জলের ফোঁটা দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোবল মারে বিধুর শরীরে। কিছুই খেয়াল থাকে না ওর। ভেজা চোখদুটো থেকে সব অশ্রু ধুয়ে দেয় গহীন রাতের বর্ষণমুখর দুর্যোগ।"*[২১]

এত বৃষ্টি, জল মরার মতো শুকনো জিভে তেষ্টা কোনদিনও মেটবে না। মনের তেষ্টা বাহ্যিক প্রবল বর্ষনে নিবারিত হয় না শুধু তৃষ্ণার উন্মাদনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। বিধু ভিক্ষুক-প্রেমের, ভালোবাসার, স্নেহের— যা স্বার্থপর সমাজ ব্যবস্থা ব্যর্থ বার্তা বহন করে বেড়ায়। সময়ের আগ্নেয় পরিধি পেরিয়ে গল্পকার গল্পবীক্ষায় সৃষ্টিচেতনাকে উদ্ভাসিত করল 'চিরহরিৎ বৃক্ষঘিরে জীবন্ত সমাধির মত রক্তাক্ত কয়েকটা বছর আর স্মৃতি, — যা এখন অনুভব বা অনুভূতি। মাঠের ঘাসে, শিশিরে বাতাসে দিনানুদিনের সেই ফিসফিসানি— মাটি-সমাধি, জীবন-শোধ! জীবনের চাওয়া-পাওয়া লোক দেখানোর পুরানো রীতিনীতিতে চেতনা থেকে অবচেতনায় মগ্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শেখর

দাশের 'গল্পহীন' গল্পের সৃষ্টি অবয়ব 'তদন্ত' গল্পে নতুন চরিত্রের অর্ন্তনিহিত ভাব বিশ্বাস্যের উর্বর জমির কর্ষনে অসহায় বোধ, অমোঘ মৃত্যুচেতনার দাহ্য গল্পবয়ানে পাঠকের মননে সাড়া জাগায়।

দরিদ্র শ্রেণির জীবন যাপন, ভাষা, প্রাত্যহিক কার্যকলাপ উনিশ বছরের নকুলের মধে স্পষ্টতর। নিম্নবর্গীয় মানুষের আচার-আচরণ নকুলের ভাষায় বয়ানের সঙ্কটগ্রস্থ অস্তিত্বের অনুভব। গল্পহীন জীবনের ভাষা ও সময়ের দ্বিবাচনিকতার বার্তাই প্রকাশ পায়। ব্যক্তি ও সামাজিক পরিসরে গল্পভাষা মর্মমূলে নিম্নবিত্ত মানুষের সামূহিক বাচন। রুগ্ন গেরস্থালি শুকনো শরীর নকুলের মা স্বভাবসিদ্ধ রূপেই সন্তান-স্নেহে কাতর ও নকুলের বাবা সংসার দারিদ্রে রুক্ষ। নিচুতলার মানুষের জীবন-যাপন ভাষা ব্যবহার সব কিছুতেই গল্পকার দক্ষতার শিল্পরূপের প্রকাশ রয়েছে 'তদন্ত' গল্পের গল্পবীক্ষায়। মা-বাবা, দাদা-বৌদির সঙ্গে বহিরঙ্গে তাঁর ব্যক্তি পরিসরে স্বর বিন্যস্ত। কিন্তু মনের গহীনে লুকিয়ে থাকে আরেক সত্তা— যা বিন্যস্ত করে গল্পভাষা ও অন্তঃস্বরের অপূর্ব মেলবন্ধন। 'ভূগোল পড়তে খুব ভালবাসে' নকুল উনিশ বছর বয়সে ক্লাশ এইটে পড়ে৷ সামাজিক ও পারিমার্শিকের ভাবাদর্শে ভূগোল প্রিয় নতুন উপেক্ষিত, নিষ্ক্রমণ, অবহেলিত, গভীর সমস্যা বা সংকট এর উদ্ভাসন প্রকৃত অর্থে কোথায় তার সত্যিকারের সমস্যার হদিস না খোঁজে মিথ্যার খোলসে আমরা জর্জরিত৷ গল্পকার তাঁর আখ্যানহীন বয়ানে নিজস্ব ভাষার সহজতর পথ ছেড়ে দুরূহ পথে পরিক্রমা করেছেন সমাজের বাঁধাধরা ফর্মূলা পরিহার করে অমোঘ পরিণতি৷ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে৷ বাস্তববাদী সংসার জগতে সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার দ্বিরালাপের ক্ষেত্র তৈরি করেছে—

> *"উনিশ বছরের নকুল তোমাদের সামনে ঘোরাফেরা করতে ঠিকই লজ্জা পায়।"*[২২]

এই সহজ সরল স্বীকারোক্তি গল্পকারের বিন্যাস ভাষাভঙ্গি বাচনে অন্তর্বৃত গভীর আকরণে উদ্ভাসিত হয়।

বুকটা ফাঁকা করে আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিজনের কাছে ধিক্কার— যারা ভালো করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাদের পরাজিত জীবনে সুখ-দুখ, আশা-আকাঙক্ষা, জীবন-স্বপ্ন, স্বস্তি-সান্ত্বনা কিছুই থাকে না।

> *"গেট আউট। বেরিয়ে যা। দোহাই তোর বেরিয়ে যা।"*[২৩]

ভাগ্যে তাই লেখা থাকে৷ যা বর্তমান সময় কঠিন পরিসরে কেন্দ্রিয় আকল্প বাস্তব কঠিন মুখের মুখোস পরে শুধু অবচেতন মনে শান্তির নীড় খোঁজে।

> *"স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে গেল বাবার ছায়া। নাঃ। ভুল। কেউ নেই ওখানটায় দাঁড়িয়ে। নকুলের সাথে এত নিবিড় বাঁধনে কেউ বেঁচে নেই পৃথিবীর বুকে।"*[২৪]

এই বয়ান আমাদের মনে করিয়ে দেয় অক্টাভিয়া পাজ **'Modern time is critical time'** এর যেন অস্তিত্বের সত্য অন্বেষণের সূত্র। নকুলের অবচেতন মনে যে স্নেহের উৎস চৈতন্য বন্ধন প্রত্যক্ষ হয় তা অ-বাস্তব। সমস্ত সঙ্গতি-অসঙ্গিতর মধ্যে আধুনিকতার সূত্র সন্ধান করে, চৈতন্যের গভীরে অন্বেষণ করে পরাবাস্তবের চিন্ময় ভুবন গল্পকার পরাবাস্তববাদীর শিল্প সমগ্রতা ব্যক্তিসত্তা গভীরতম স্পন্দন অনুভব করেছেন বলেই জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে মূল্যবান সত্তা সম্পর্কে সচেতনার অমেয় শিল্পরূপকে কাজে লাগাতে পেরেছেন।

ব্যক্তি পরিসরেও সামাজিক স্বর বিন্যস্ত করেছেন শেখর দাশ। তাঁর গল্পভাষার মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন আছে দ্বিবাচনিকতা। নিচুতলার মানুষ জীবন সংসারে নানাভাবে প্রত্যাখ্যাত। নকুলের মৃত্যুর মধ্যেই স্থবির সমাজের রূপচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে—

> *"আয়নার মত চোখ দুটোয় মৃতের বাপ নিজেকে দেখে নেয়।"*[২৫]

গল্পভাষা ও পাঠকৃতিতে ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ় জীবন সম্পর্কিত দার্শনিক ব্যঞ্জনা সামাজিক সত্তার দ্বিবাচনিকতায় উদ্ভাসিত। লেখকের বয়ান আমাদের অনুভূতিতেও বর্তমান।

> *"যদি কোনদিন জন্মাও এই পৃথিবীর বুকে তবে দেখবে আমাদের জন্ম ও মৃত্যু কী নিদারুণভাবে ঈশ্বরহীন।"*[২৬]

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক পালাবদলের পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় মানুষের হাহাকার ভাঙাগড়ার নিষ্ঠুর খেলা শেখর দাশের 'আপাৎকালীন' গল্পে অন্বিষ্ট। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সমস্যায় ব্যতিক্রমী প্রয়াস বিশেষ মানব মনস্তত্ত্বের নিরিখে অঙ্কিত গল্পের প্লট। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালির ভাবনাবিশ্ব ও চিন্তাজগৎ যখন ভেঙে যেতে লাগল তখন পৌর সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কূটাভাস সমাজের এই গভীরতর অসুখ ক্রমশ প্রকটিত হতে লাগল। গল্পের আদলও বদলে যেতে লাগল। গল্পহীন গল্পের আখ্যানে গল্পকারের এই গল্প আরও সমৃদ্ধি করল জীবনের অমোঘ বার্তা— সময় ও পরিসরের অভিনব দ্বিরালাপ ফুটে উঠেছে এভাবে—

> *"জমির ওপর দাড়িয়ে থাকা অগুন্তি মানুষ নিষ্পলক*

চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। ভারী ভারী বিমানগুলো হঠাৎ হঠাৎ উড়ে যায় মানুষের সব আশা আকাঙক্ষাকে খুবলে দিয়ে। ... তবে তো সেই রিফুজিরা আবার আসবে। তাই না। ... এক সময় প্রায় আর্তনাদ করে নলিনী ভগবান, ঐ ক্ষুধার্ত হায়নাগুলো এলে আর রক্ষে নেই।"[২৭]

প্রান্তিকায়িত মানুষের বোধের গভীরে ভাঙচুর, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, দুর্ভিক্ষের সর্বব্যাপী হতাশার পটভূমিকে গল্পকার বাস্তবের নিগূঢ় চলচ্ছবিতে অঙ্কন করেছেন। নিরন্ন অন্তেবসবাসকারীর সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার টানাপোড়নে সময়ের ও জটিলজীবনের সময়চিহ্নিত পরিসরের প্রতিবেদন। যুদ্ধ, দাঙ্গা, অভাব-অনটন সমাজে বর্তমানে ও অস্তিত্বের বিপন্ন সুর আমরা প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং গল্পের প্রতিবেদনে সময়ের অস্থির মর্মবেদনা ও নিচুতলার মানুষের গভীরতর বিষাদের ছায়া স্বর ও কালবির্বতনে একই সমাজের ভাঙাগড়ার বিভৎস রূপ প্রকাশিত। দেশভাগ (১১৪৭ খ্রীঃ), ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), ভাষা শহীদ (১১৬৩ খ্রীঃ) ও পাকিস্তানের শোষণ থেকে বাংলাদেশের জন্ম (১৯৭১ খ্রীঃ) বাঙালি মননে গভীরশোকের ছায়াপাত করেছে। যুদ্ধ মানুষের জীবনে শুধু যন্ত্রণার, হারানোর মর্মবিদারক হৃদয় ঝলসে দেওয়ার কুৎসিত ভয়ানক ছবি। দেশভাগ আদিপাপের জ্বালাময় আগুন নিবারণ হতে না হতেই ইতিহাসের নিষ্ঠুর খেলা বাঙালির মননে আবার দাগ দিল। যার উত্তাপ শুধুই বাঙালিকে বিদ্ধ করল। গল্পকারের গল্প বয়ানে বাস্তব ও কল্পনার, স্বর ও অন্তঃস্বরের দ্বিবাচনিকতা—

"বস্তাবন্দী লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা অনন্তকাল থেকে এহাত-ওহাত হচ্ছে অনবরত।" [২৮]

এই উচ্চারণ বস্তুত গল্পকারের ব্যক্তিসত্তার কণ্ঠস্বর। সমাজের পুঁজিবাদী লোভাতুর মানুষের নির্মম শোষণ চক্র। সর্বহারাদের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়া, নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করা দৃষ্টির অগোচরে উপস্থাপনা এবং ভাষা-বয়ন গল্পত্বের মধ্যেও লক্ষণীয়। 'ও প্রাচীন তাই ওর ক্ষুধা বেশী।' নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পরিসরে সাংকেতিক চিহ্নায়নে দার্শনিক উদ্ভাসনে পৌছে যায় বহু রৈখিক ও বহুবাচনিক পরিসর।

নিঃসহায় নিঃসম্বল মানুষদের মধ্যে যুদ্ধের যে আতঙ্ক লেখক দেখতে পেয়েছেন তাদের বয়ানের মধ্যে অতীতের অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া জ্বালাময় তিক্ততা। যুদ্ধে নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার বেচাকেনা, মহাজনদের আধিপত্যের বিস্তার; জগৎ ও জীবনের স্তরে স্তরে রয়েছে সমসাময়িক অনুপুঙ্খের যে বিন্যাস তার প্রকাশ আমরা পাই—

> *"এভাবে নিস্তব্ধ প্রান্তরে যুদ্ধের খবর এসে পৌঁছায় বাতাসের বেগে। সেই খবর শুনে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। অনেকে আবার শিউরে উঠে বিগত যুদ্ধের কথা ভেবে। এই শহরে এখনো অনেক লোক আছে যারা যুদ্ধ তাড়িত। যাদের সমস্ত শরীরে আজো যুদ্ধ জড়িয়ে আছে।"*[২৯]

যুদ্ধ, মন্বন্তর মানুষের জীবনকে কিভাবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে হতাশা দিশাহীন করে দেয় তারই আখ্যানের নতুন আকল্প সময় বহুস্বরিক, সময় ব্যক্তিসত্তার নির্মাতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকসত্তার দ্বিবাচনিক বিন্যাসও আমরা দেখতে পাই।

'নলিনীর স্মৃতিচারণা বড় মারাত্মক' যুদ্ধের অসহায় পরিণতির ফলে

জন্মভূমি ত্যাগ, জন্মভূমির প্রতি মায়া, ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি মানুষকে স্মৃতির আশ্রয়, অবচেন মনে শুধু ঘুরে ফিরে ভুল ত্রুটি, ফিরে পাওয়ার বাসনা যন্ত্রণায় বিধুর করে তোলে, আসলে গভীরতর জগতের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করার জন্যই পরাবাস্তব চেতনায় চিত্রকল্প হিসেবে ব্রেতোঁর মতো মানুষের পরাজয় কাম্য নয়—

> *"কই, আমাদের জিৎ হল কোথায়? যুদ্ধে আমরা হারাচ্ছি মাকালের মত। এবারো বোধ হয় পুরোপুরি হেরে যাব। বোমারু এলে এবার আর গর্ত্তে নয়। মাঠে, মাঠে বেয়ে দাঁড়াবো। মারো শ্লা মাথার ওপর যত বম। শালা কুত্তার দল।"*[৩০]

স্বপ্নিল চোখে বাস্তব সমাজের বিভৎস রূপ বুকে নিয়ে অপর সত্তা শুধুই বিব্রত করে পরিবার পরিজনকে যা অতি সাধারণ, মৌলিক চাহিদা পূরণে সঞ্চিত ধন সোনার দুগাছি বালা তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না, এভাবেই সর্বকিছু শান্তি, সুখ, ক্ষুধা, ভবিষ্যৎ বন্ধন দিয়ে 'ওরা মিশে যায় অন্ধকারে'। এভাবেই সময়ের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে সংসারে সাধারণ মানুষ অকাতরে শুধু অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে— তার খেয়ালই আমরা রাখি না!

ফেরারীর আগের গল্প 'জোড় শালিক' নীচুতলার মানুষের জীবন অত্যন্ত কঠিন সময়ের বাস্তব করুণ কাহিনির গভীরতর প্রতিবেদন বনমালী ছোট ভাই সতু স্ত্রী পারুলকে নিয়ে অভাব-অনটনের মধ্যেও সুখী। গল্পে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তব চিরপরিচিত স্বর ও অন্ধকারের উত্তাপ। বক্তব্য ও অবস্থান বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। দেশভাগ এর কঠিন চিত্রে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিকার, ক্ষয় ও জীবন যুদ্ধের প্রান্তিকায়িত চেতনার পথগামী বনমালী

ও সতু।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্পের শুরুতেই নতুন প্রাণের আগমণ-বার্তা নিয়ে গল্পের শুরু। সময়ের স্রোতে ভাসমান দরিদ্র-বস্তির মানুষ প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে। প্রখর বাস্তববোধে বিপন্ন মানুষের সমাজের অনন্বয় ও আত্মসর্বস্বতা জীবনের রূপ প্রকাশিত হয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষের সহজাত আচরণ আর ভালোবাসা মদনের আচরণে যেন আরও বাস্তব হয়ে ওঠে—

> *"যে জন্মায় সে এমনি জন্মাবে, যে মরতে চায় সে আপসে মরবে।"*[৩১]

তাদের জন্ম-মৃত্যু জীবনব্যাপী ধারাবাহিকতা যতই দুর্বল হোক না কেন! শ্বাসরুদ্ধ জীবন-প্রণালীতে সান্ত্বনার পরিসর তৈরি করে নেয়। গল্পকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, নিম্নবর্গীয় মানুষের গভীরতর অনুভবের আকল্প। বনমালী বেশ খরচাপত্তর করে মাদুলী পরিয়েছে পুরুলকে, লোকসংস্কারের ভিত্ রচনা নিম্নবর্গী সামাজিক আচরণ সর্বহারা মানুষের চিরকালীন সঙ্গী মদনের দ্বিরালাপ জীবনব্যাপী উত্তরণের সম্ভাবনা তর্জনী সংকেত করে। মদনের সামাজিক ভাবাদর্শ লেখকসত্তার উদ্ভাসন।

নিচুতলার মানুষের জীবনকে একটা অভাবের যুদ্ধক্ষেত্র-সর্বহারা বর্গের অন্তেবাস করেও গল্পকার অসামান্য জীবনীশক্তি দিয়ে নির্মাণ বনমানী আর সতুর চরিত্র। দুই ভাইয়ের টুকরো টুকরো বয়ানে গড়ে উঠেছে জীবনের প্রতিবেদন। বাস্তব জগতে অর্হনিশি আত্ম-সংকটে ভেঙে পড়ার মানুষ ও এক টুকরো সুখের খড়কুটো ধরে শংকাহীন জীবনযাপন করে। বনমালীর কুঁড়ে ঘরেও চাঁদের আলো, শান্তির নীড় খুঁজে পায় সদ্য আগত শিশু বাচ্চাটিকে কেন্দ্র করে।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে প্রেম-ভালোবাসা প্রাচুর্য অন্তরে থাকা সত্ত্বেও বনমালী

ও সতুর বয়ানে ধরা পড়ে নিরাসক্তির বার্তালাপ। আসলে আর্থিক টানাপোড়েনের মাঝখানে নিটোল ভালোবাসার প্রলেপ পড়ে যায় শুধু একটু উষ্ণ আবেগে সব খোলস খসে গিয়ে মহামূল্যবান আবেগ ইন্দ্রিয় সংবেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে। 'মাঝে মাঝে আবেগ ও জ্বালা দেয় বড়' বাচনে বাস্তবতার বহুমাত্রার কথা মনে রেখেই গল্পকার সূক্ষ্ম চেতনার রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

যতই দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, দারিদ্র থাকুক না কেন মানুষের সব জটিলতার উর্ধে লুকিয়ে থাকে নিম্নবিত্ত মানুষের সুখের চাবিকাঠি— শেখর দাশের গল্পের ভাববিশ্বে রয়েছে সুগভীর সৌন্দর্যবোধের সংকেত। যা এই গল্পের বয়ানে কুৎসিত জীবনের কঠিন পথে হারানোর বেদনাঘন বাস্তব চিত্র যেমন অঙ্কিত করেছেন, ঠিক তেমনি হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা জীবনচেতনার নির্যাসটুকুও ছেঁকে নিয়েছে।

> *'বস্তির আকাশে ও চাঁদ উঠে। দাওয়ায় ঘুমোচ্ছে সতু। এই ভাবে সতুও একদিন জন্মেছে। বড় অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে সতুর জন্মক্ষণ। তারপর দুঃসহ জ্বালা ক্ষোভ নিয়ে ত্রিশ বছর। অনেক ঘাত-সংঘাত, অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা। আজকের এই নীল আলোভরা আকাশ ভুলিয়ে দিতে পারে সবকিছু। বনমালীর মনে হয়— পৃথিবী এখনো কত মনোহর!"* [৩২]

পালাবদলই হচ্ছে একজন চিরকালীন সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) রচনার পর 'প্রভাত সঙ্গীত'এ (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের চেতনা, ভাবনা, প্রেম ও আনন্দ একটা বিচিত্র ঐশ্বর্যে অভাবনীয় সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছে— যা রবীন্দ্র কবিভাবনার বৈচিত্র্যপূর্ণ পালাবদল বিশ্বের দরবারে গণ্ডী ও সীমা অতিক্রম করে অসীম ও অরূপের পথে যেমন জয়যাত্রা শুরু হল; ঠিক তেমনি

শেখর দাশেরও পালাবদল হয়েছে এবং তা সাহিত্য ও সমাজের দর্পণ 'শতক্রতু' লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে—

" 'জীবনের কোনো স্থিরতা নেই।' বিশ্ব সংসারে এই অমোঘ বার্তা বহন করে 'ফেরারী' গল্পের সূচনা। গল্পের ভাষা-ভাব, রস-ছন্দ অসামান্য কৃতিত্বের দাবীদার। বলাবাহুল্য প্রান্তিককায়িত অঞ্চলে জীবন-যুদ্ধ যেখানে অহর্নিশি, বিদ্যমান, সেই উপত্যকায় 'ফেরারী'র মতো সুসংবন্ধ লেখা প্রতিভাবান লেখক ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। গল্পকারের গল্পে নব্যবাস্তবের গভীর মনন ও আত্মা অনুসন্ধিৎসু বিচিত্রা নির্মাণ সময় ও পরিসরে বিবরণ ও ভাবকল্পগুলো সুসামঞ্জস্য প্রতিনিধিত্ব। জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নীলু দিকে ঘিরে সৈকতের পৃথিবীর সফলতা ও সরলতা। সময়ের আখ্যানে নিঃসঙ্গ সৈকতের শুধু ভালোলাগা মুহূর্ত নীলুদির ভাবনাময়তা। অপেক্ষারত মন যেমন চায় নিবিষ্ট সান্নিধ্য যত্নের পরিপাটি ভালোবাসার পাত্রীর কাছে প্রেমিক অফুরন্ত আশা-হৃদয়ের ভিতরের গভীর সিংহাসন দখল করার। আর গল্পের নায়ক সৈকতের চিরকালীন অপেক্ষা থেকে যায় নীলুদির কাছে আশ্রয়ে, দুরন্তপণা, সব কিছুই প্রযত্নে সুখে থাকার চাবি। বাহির থেকে বুকের গভীরের আশ্রয়ের।

গল্পের বয়ানে সৈকত ও নীলুদির অর্ন্তবয়নে অন্তহীন গ্রন্থনা। লেখক সত্তার স্বতন্ত্র ভালোলাগার বিষয়টি বারে বারে ফিরে আসে স্মৃতির মণিকোঠায়। সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবন ও সামগ্রিক বাতাবরণ সব কিছু পরিবর্তনের নতুন আবহাওয়া তৈরি করে নেয়। মানুষ নিজেই সময়ের সুরে, তালে, লয়ে নিজেকে রাঙিয়ে নেয়। এই আত্মনির্মাণের প্রকরণ অবলম্বন করে নদী বয়ে চলে মহাসাগরের দিকে আর সময় নতুন আকরণে এগিয়ে চলে মহাসময়ের অস্তিত্বে মিলিত হবার লক্ষ্যে। শেখর দাশও পুরাতনের গন্ডি ভেঙে অপরতাপুঞ্জে

উত্তালস্রোতে মহাসময়ের ক্রমপাঠে জীবনকে রঞ্জিত করে তুলেন কলমের লেখনীতে। অতীতের অনেককিছু হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের অতল গহ্বরে। স্মৃতিই তুলে আনে হারিয়ে যাওয়া অজস্র রাশির মধ্যে অপরসত্তার বিশিষ্ট মুহূর্ত।

শান্ত, ধীর, স্থির সৈকত ভালোলাগার ইনুরদির কাছে এলে চঞ্চল ডানাকাটা ফড়িং এর মতো অনবরত লাফাবে। গল্পে সৈকত আর গল্পকারের ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়— যদিও নীলুদিকে কেন্দ্রে রেখে বিষয়টি আবর্তিত হয়েছে। স্মৃতির গ্রন্থনায় গল্পের বিনির্মাণ অসাধারণত্বের দাবী রাখে। পথ যেন স্মৃতির ইশারায় ডাকে সুদূর স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে সৈকতের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিসত্তাকে—

> *"তোমরা যদি রাঁচী যাও তো সেখানকার আকাশ-বাতাসকে বলে দিও, আমি ভাল আছি। কিন্তু সাবধান, মোরাবাদী মাঠের সেই ঘুমন্ত স্বপ্নের ঘুম যেন ভুলেও ভেঙে দিও না।"*[৩৩]

জীবনানন্দের চিত্রকল্পের আশ্চর্য দ্যুতি লক্ষ্য করা যায় গল্পবয়ানের ক্ষেত্রে। জীবনের গভীরের অবগাহন করার জন্য গল্পকার প্রতীকী বর্ণনায় গভীরতর জগতের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেছেন গল্পকার—

> *"রেলগাড়ী বাদামী, রেল গুমঠি বাদামী, রেলের ক্ষুদেক্ষুদে পুল বাদামী।" কোথায় কোথায় হারিয়ে যাওয়া নিঃসঙ্গ রেললাইন ও বাদামী। এক ধরনের বাদামী নিঃসঙ্গতা।"*[৩৪]

গল্পে বয়ানে আমাদের জীবনে অনেক ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা বিলুপ্ত হয়ে

যাচ্ছে সময়ের চোরাবালিতে। 'আজ কাল রাখালের পাট চুকে গেছে। নাহলে গরু আর রাখালের পায়ে ঝিলিক দিত গোধূলি। পৃথিবীর বহুবিধ জিনিষ স্থিরতা হারিয়ে ফেলে শীগগীর। কোনকিছুই স্থায়ী নয় বিশেষ।"

কথায় বলে, 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু' সেই বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত উক্তি আমাদের সহজাত সরল সুন্দর জীবনে যেন প্রতি মুহূর্তেই অধিকার জানায়। স্নেহ, প্রেম মানবিক প্রেমে আবদ্ধ করে জগৎ সংসারকে এক মায়ার জালে জড়িয়ে রেখেছে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গ একা বাঁচতে পারে না, তাই মানুষ আশ্রয় খোঁজে আপনজনের কাছে আর সৈকত আশ্রয় খুঁজেছে নীলুদির কাছে। তাঁর রূপ ব্যক্তিত্ব সব কিছু যেন স্বপ্নের রাজ্যের আধার। সৈকত যেন জীবনানন্দের বনলতা সেন এর পরশমণি নীলুদির মধ্যে খুঁজে পায়— 'তোমার চোখে নীল জল দেখে অনেক জাহাজ ভুল পথে বন্দর ছেড়ে চলে যায়।'

জীবনে আশা-ভরসা অনেক জিনিস চোখে দেখা তো মিলে যায়, পাওয়া না পাওয়ার দূরে থাক। অল্পতে আনন্দ, খুশি খুঁজে নেয়, সময়ের বাস্তব বিপন্ন অবয়বে সৈকত। তাঁর ভাবনাবিশ্ব প্রকৃতির আদল পড়ে কোন সুন্দর রমনীর কাব্যময় দ্যোতনা প্রকাশ পায়—

"ছিপছিপে, পাতলা দুধের মত গায়ে রং, ভুল
করে অর্ধমৃত পাখীর মত কপালে নীলটিপ ...।
এরকম নারীদের বোধহয় কোনো নিবাস নেই।"[৩৫]

মানুষের জীবনবোধে অনেক সময় অতি সাধারণ বয়ানের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে জীবনের নিগূঢ় অর্থ। অসাধারণ ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত কথা বুকের গভীরেই রয়ে যায়। নীলুদির সহজ-সরল কথায় লুকিয়ে থাকে জীবনের অমোঘ চিত্রকল্প—

"আমি চলে গেলে তোর কি হবে?"[৩৬]

সময় ও নদী স্রোত কখনও থেমে থাকে না, জীবনও কারোর জন্য থেমে থাকে না, সে ঠিক খুঁজে নেয় পথ চলার পাথেয় অনেক মূল্যবান স্মৃতি উপলব্ধি। প্রকৃত বিশ্বজগৎ সৌন্দর্যরূপ প্রেম ও নিসর্গ প্রত্যয়ে গল্পকারের ব্যক্তিসত্তা জগতের পরিবর্তন ঘটে যায়, স্থিরতা নেই কোথাও 'নোনা জলের স্বাদ নিয়ে সমুদ্রের পাশে থাকবো চিরকাল' জীবনের পরম চাওয়া পাওয়া অসীমের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায় জীবনরূপী নদী সাগরে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায় বিপন্ন বাস্তব জগতের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সূত্রে।

জীবনের আশে-পাশের টানাপোড়েনের খড়ের আচ্ছাদনে অন্ধকারময় জগতের দুঃসহনীয় জ্বালায় আশ্রয় খুঁজে নেয় বিশ্বপ্রকৃতির কূলে। প্রকৃতির সেই নিবিড় সান্নিধ্য মেঘলা আকাশ ধানের শীষে পাখির ক্রীড়া, হু-হু বাতাসের তাপাং বিল, বালুচর নিঃসঙ্গ মানুষের সাথে মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, আশ্রয়হীন আশ্রয় দান সুখের চাবিকাঠি সব কিছু বিলিয়ে দেয়— পরিবর্তে কিছুই নেয় না। শুধু বিলিয়ে দিতে জানে।

সৈকত থামতে জানে না, চলার পথে অনেক মূল্যবান জীবনের আকল্প খুঁজে নেয় বৃদ্ধ ব্যক্তি সংসারের ভীড়ে নির্বান্ধব হয়ে পড়ার অভিব্যক্তি সৃষ্টিশীল বয়ানে জীবনের স্থাপত্য গড়ে নেয় কিংবা চিন্তাজগতে গল্পকারের মোহনপুরের প্রকৃতির অনুরূপ শ্যাওলী ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধির 'ধূপছায়া'র নির্যাস।

সৈকত সব কিছুর মধ্যে থেকেও আলাদা, মানুষের ভিড়েও নির্বান্ধব, প্রমথদা থেকেও বিবাগীচিত্ত। নীলুদির সঙ্গ তাকে নিটোল ভালোবাসার দ্বিরালাপে আনন্দ, সুখ, উষ্ণতার স্পর্শ গল্পের কথাবস্তুতে পরিসর প্রকাশ পেয়েছে। আবার সাধারণ হয়ে অসাধারণ থেকে যায় সৈকত নীলুদির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে খুঁজে নেয়

জীবনকে সফল করে তোলার গভীর প্রত্যয়। আর এভাবে মানুষের সান্নিধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে তার চেতনা। যার নাম জীবন, 'আর যাকে ঘিরে ঘিরে ক্রমশঃ স্মৃতি আর স্মৃতি। সময়ের সাথে সাথে গল্পকারের উপলব্ধি ধীমান আরো বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে।

'আসন্ন বিকেলের শেষে' শেখর দাশের ব্যক্তিত্ব এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব আবর্তে অবচেতন মন নিজের অন্তরে তৈরি করে সহজাত কথাকথন। দিকনির্দশন বুঝতে হলে পাঠকেও তার নিস্তব্ধ জগতের সীমারেখা পার হয়ে যেতে হবে—

> *"তুমি দিগন্ত পেরিয়ে যাও। দিগন্ত পেরিয়ে যাও।*
> *দিগন্ত পেরিয়ে যাও"*[৩৭]

সীমাবদ্ধতা গণ্ডিবদ্ধ শিকল অবক্ষয়ী সময় ও সমাজের বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণ নিবিষ্টভাবে লক্ষ করা যাবে না। কেন্দ্রচ্যুতির অস্থির সময়ে সমাজের কীটদষ্ট সংস্কারের জীবনের সৃষ্টিশীল সংগ্রামের তাৎপর্য হারিয়ে যেতে লাগল সমঝোতার চোরাবালিতে।

নিম্নবিত্ত জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণে এবং তাদের মানসিকতার রূপদানে গল্পকার বাস্তবে দেখা চিরপরিচিত বাস্তব চিত্র সুচারুরূপে অংকন করেছেন। সুন্দর ও ভালোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে জীবনের গ্লানি আর নির্মম কাহিনি— যা আমরা আদানপ্রদান করতে কুণ্ঠবোধ করি। তাই সময় সচেতন গল্পকার পাঠককে নিজস্ব গণ্ডি ভেঙে গল্পের দার্শনিক ব্যঞ্জনা অনুধাবন করার এক অভূতপূর্ব প্রয়াস গল্পের শুরুতেই লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক গভীরে চুপচাপ যন্ত্রণার অজস্র হাত ঘোরাফেরা করে। দেখা যায় ভাঙনের ইতিহাস। গল্পের প্রথম ভাগে পীরুর কথনে একটি

পরিবারে পরিচয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— তেষট্টি বয়সের কম্পাউণ্ডার চিদানন্দ রায়ের আইবুড়ো দুটি মেয়ে রূপসী এবং সরসী আর বয়স্ক বখাটে ছেলে চিন্ময়। পরীর বয়ানে ধরা পড়ে অসুস্থ সমাজের গভীরতর দিকটি বিশেষত, চিরুর আচরণে। বুড়ো বাপের উপর হাত উঠানো চিরকালীন অসামাজিক চিত্রের করুণ দৃশ্য। নিচুশ্রেণির পরিবারে মেয়েদের বয়স হয়ে গেলে তাকে আর সমাজ ভালো চোখে নেয় না— 'আইবুড়ো' মেয়েদের বিপন্ন জীবন সামাজিক পরিসরে সামগ্রিক সমস্যার জ্বলন্ত পরিধিকেই তুলে ধরেছেন লেখক। সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ভয়াবহ অন্তঃসারশূন্যতা কথকতায় শুধু 'ধার করা স্বপ্নে কিছু সময় ঘোরেই কাটায়' বার্তা বহুস্বরে অন্তর্দীপ্ত হয়ে ওঠে। শোষিত শ্রেণির আর্তনাদ হয়তো বা একদিন সমস্ত অত্যাচার শোষণ বন্দীত্ব সব ভেঙে মুক্ত হবার স্বপ্ন দু-চোখে তুলে ধরে লেখক সত্তা—

"পাখির মত ডানা ঝাপটে ওরা উড়ে যাক সেখানে,
যেখানে দেহের বন্দীত্ব ওৎ পেতে নেই আর।"[৩৮]

দারিদ্র্য-শোষণ থেকে মুক্তির বার্তা একমাত্র মৃত্যুই এনে দিতে পারে। সহজ সরল অভিব্যক্তি চিরকালীন বন্দীত্ব থেকে মুক্তির ঘ্রাণ মাত্রা থেকে মাত্রান্তরে নিয়ে গেছে।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপাটি প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য, চিন্ময় বখাটে কিন্তু তাঁর মধ্যে ধরা পড়ে নৈতিকবোধও অস্থির সময়ের অসামাজিক আচরণে অনুতপ্ত এবং বেদনাবিদ্ধ দহনময় জীবনে শাসন অনুনয় করে উত্তরণের পথ সে খুঁজে ফিরছে। শত ব্যথা কষ্ট মা সান্নিধ্য পথ ভ্রষ্টা মানুষ নীড় খুঁজে বেড়ায় মায়ের শীতল শান্ত পরিতৃপ্ত আঁচলে। মানুষের চিরদিনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ মিলে ঘরের স্বপ্ন। অভাব-অনটনের রাজনৈতিক উত্তাল হাওয়ায় সবকিছু যেন ইট-

বালি-পাথরের দেয়াল ছেড়ে পালিয়ে গেছে শোষিত৷ অত্যাচারিত সর্বহারা মানুষদের কাছে। সেই একই সুর ধ্বনিত হয়— 'ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও সব।'

অবচেতন মনে আত্মক্ষয়ী যুদ্ধ, একঘেয়ে আর্তনাদ, শূন্যগর্ভ আবেগ, ক্লান্তিকর দহন জ্বালা থেকে ক্রমাগত বাইরে সরে যাওয়ার পথ খুঁজে পড়ে৷ অস্থির সময়ের আকল্পে বহির্মুখী বাস্তবতা অতীতের যন্ত্রণা বিধুর স্বপ্নভঙ্গে ভাষায় সময়ের তিক্ততা ফুটে ওঠে৷ যৌবন উত্তাপ বিপথগামীর মতো রেণবউদির সান্নিধ্যে ভাষা শব্দে বহু পুরোনো অনেক প্রাচীন তিক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে গ্রথিত আছে— চিন্ময়ের সত্তা যেন দরিদ্র সমাজ শ্রেণির বেকার যুবকের আত্মবিলাপ।

সরসী কথনে যৌবনের গ্লানিকর বিষাদ নিয়ে বাহ্যিক আনন্দ ভাবনার বিচিত্র অনুভব অর্ন্তসত্তার চিত্রকল্প পাঠক সত্তার আরো গভীরে দৃষ্টিপাত করতে আমাদের প্রাণিত করে। প্যাকিং বাক্সের কারখানায় একমাত্র কর্মচারী কুৎসিত সমাজের বেড়াজালে আত্মসত্তার অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয় মানুষদের শোষিত দুঃখ-সুখের কণ্ঠস্বর। দ্বন্দ্বময় নারীর আধিপত্যবাদী সমাজের প্রতিভূ কারখানার ভদ্রলোকের কাছে অন্তর্বয়ন মানুষ জানোয়ার নিষ্ঠুর পীড়নের বাস্তব প্রতিবেদন। তদুপরি মাতৃহৃদয়ের আবেগ সমাজে অপ্রতিষ্ঠিত হলেও সময় ও সমাজ চেতনার কাছে মুক্তির প্রতিভাত—

"আশ্রয় চায়। মুক্ত চায়। আলো চায়।"[৩৯]

ভাষা-শব্দে গল্পকার জীর্ণ সমাজে লুকিয়ে থাকা এক অমোঘ অসুস্থের ইঙ্গিত করেছেন গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের বয়ানে। চিদানন্দ চরম দারিদ্রতার মধ্যেও

অবচেতন মনে জীবন সঙ্গী সরমার সান্নিধ্য অনুভব করে। 'মানুষের ব্যথা বড় রহস্যের' আর মানুষই পারে তার উপশম করতে— কারণ মানুষ সামাজিক জীব, একা জীবন কাটানো খুব কঠিন। গরীব চিদানন্দ কথন ও মনস্তাত্ত্বিক বয়ানে সংকেতচিহ্ন আভাসিত হয়—

> *"এখন ছেঁড়াকোটে তাপ্পি মারি, পরপর কয়েকবার গন্ধ শুঁকি। ময়লা কাচিনা। ভয় হয়, যদি সেই গন্ধটা ধুয়ে যায়।"*[৪০]

বর্তমান ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের স্মৃতিবিজারিত ঘটনা শুধুই পিছু টানে, আর জীবনের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবজগতের সমাজ-দেশকাল যখন ব্যর্থ মৃত স্ত্রী যেন অলৌকিক ভাবে সব কিছু প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসায় আবদ্ধ করতে চাইছেন। জীবন যখন সামগ্রিক ভাবে সংকটময়, সময় ও তখন হারিয়ে যায় স্মৃতির পাতা থেকে, জন্ম প্রচ্ছন্ন অন্য আরেক মনস্তাত্ত্বিক বয়নের সংকেত ময়তার শব্দ— 'চরাচরে হারিয়ে যাওয়া, কূজনের শব্দ, মৃত্যুর শব্দ, ক্লান্তির শব্দ, স্ত্রীর শব্দ, সুদীর্ঘ কুড় বছর আগেকার মধুর সহবাসের শব্দ'। পাঠক মহলে জীবনানন্দের কবিতার যেন শব্দের অজ্ঞাতপূর্ব। ভাবসংগতির ক্ষেত্রে দেখা গেল নূতনতর গ্রন্থনা। স্থবির সমাজের দুর্বলতা ও স্থবিরতার খোলস যেন খসে পড়ে আমাদের সম্মুখে।

পিতৃ হৃদয়ের অসফলতা গ্লানি-দুঃখ সব কিছুর অবচেতন মনের নিভৃতে অন্য বাস্তবের বয়ান সৃষ্টি করে। ছেলের অসামাজিক আচরণে বারে বারে খুঁজে ফিরে জীবনের আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দের অন্য জগত। দ্রুত ক্ষীয়মান ক্লিষ্ট বাঙালি সমাজের যেহেতু মূল্যবোধ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে— নতুন ভাবনা, নতুন আঙ্গিকে, নতুন কল্পনার নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে। সময়ের অবয়বের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই ফুটে উঠে।

গল্পকার মনস্তত্ত্ব সচেতনতায় একটি পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের কথনের সাহায্যে জীবন কিভাবে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে সমাজের নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গি। 'প্রগাঢ় শূন্যতার নামই জীবন' বার্তায় অনালোচিত দিক চিন্তাচেতনায় গভীরতম নিদ্রাকে ভঙ্গ করে আলোকিত করতে চায় বিশ্বজগতকে।

আমরা জীবনানন্দের চিত্রকল্পের মধ্যে রহস্য নিবিড় বহুমাত্রিক জীবনের পরিচয় যেমন পাই, ঠিক তেমনি গল্পভাবনায় গল্পকারের জীবন-মৃত্যু বহুমাত্রিক বিস্ময়কর আবেদন ও অনুরূপভাবে পাই। অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের বিপন্ন জীবন আত্মপরিক্রমায় মানুষের মৃত্যু হলেও সময়ের অমেয় আঁধার সমাজসত্তার অন্তঃস্থলে এগিয়ে যায় শুধু সত্যের অমোঘ আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

আমরা রূপসীর কথনে দেখি জীবনের কঠিন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে ভালোবাসার পাত্রের জন্য ঠাকুরের কাছে স্পর্শকাতর আবেদন—

> *"এক রত্তি শিশুর মত তুমি আমার বুকে বিঁধে আছে।*
>
> *তুমি সুস্থ হও। ঠাকুরবাড়ীতে অনেক আগেই তোমার নামে মানত করেছি। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। ওরা মোটেই তোমার খেয়াল করেনা, আমি জানি। আমারো উপায় নেই। তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া নিষেধ। না হলে দিনরাত তোমার শিয়রে বসে থাকতাম।"*[৪১]

সহজ-সরল জীবনে ক্ষীণতম অগাধ বিশ্বাস নিয়ে মানুষ আজও বেঁচে আছে। আর এই বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখা শুধুমাত্র ভালোলাগা প্রেমিকের জন্য

নয়, স্বপ্ন দেখে একটা সুস্থ, সুন্দর-ভালো সমাজের যেখানে অবিবাহিত মেয়েদের জীবন সহজ সুন্দর আলোময় বার্তা নিয়ে আসবে ভোরের আলোর মত। দরিদ্র পিতার সহস্র বোঝা লাঘব করে আলোর দিশা দেখাবে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থাপনে।

পরিচিত জগতের সীমাবদ্ধতা ভেঙে শূন্যগর্ভ আবেগ, তিক্ততা, জ্বালা, যন্ত্রণা, জাগতিক মুখোশপরা বেদনা খুঁড়ে খুঁড়ে খায়—

> *"পরম মমতায় ফিসফিস করেন, বড় পুরোনো জিনিস রে! অনেক স্মৃতি অনেকা"* [৪২]

মানুষ যেমন উর্ধ্বগামী, ঠিক তেমনি স্মৃতিবিজড়িত না হলে কঠিন আবর্তে অচল হয়ে শুধু মেশিনে পরিণত হয়, যার স্মৃতি নেই, তার জীবনও নেই।

ভালবাসার আশ্রয়ভূমির প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় নষ্টালজিয়ায়। গল্পকার বির্নির্মাণের শিল্পবোধ সময় চেতনার অন্তবর্য়নের নিরিখে প্রতীতি হয়ে উঠে অনন্বয়ের স্থায়িত্বে।

রূপসীর বার্তায় সেই বাড়ির একই মানুষের জীবনকাহিনি তুলে ধরে পাঠক মহলে। যেখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র যৌবনকাল পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে। এই আসন্ন বিকেলে সার্বিক জনজীবনের স্পষ্ট চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন গল্পকার।

অসুস্থ পীরুর ইনজেকশন দেওয়ার জন্য চিদানন্দ স্মরণাপন্ন হন, না বলা সত্ত্বেও রূপসীর অনুনয়ে বাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের গ্লানি আর রোষ ভিতরে ভিতরে মনোবিকলনে অনেক মনের সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়— পীরুর বুকে

টিকটিকির কাটা লেজ মৃত ঘটনার মধ্যে জীবনের উৎস ও শেষ লুকিয়ে আছে। মৃত্যু জীবনের সহাবস্থান মানবিক জীবনকে রহস্যময় ও রূপকময় করে তুলে ব্যঞ্জনা আর দ্যুতিময়ের কল্পনায়।

ভাষা-শব্দ প্রয়োগ প্রতীকী বিশ্বের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা চিত্রকল্প। অস্থির সময়ের বাস্তব চিত্রকল্পে, সুপ্ত ও জাগরণের আশ্চর্য গ্রন্থনা। গল্পের চরিত্র অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় তারাও অসুস্থ আর গভীরতর অসুখের বার্তা যেন লেখকসত্তাকে বিচলিত করে। অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে লুকিয়ে আছে লেখকের ব্যতিক্রমী প্রয়াস— পাঠক মহলকে গভীরতর নাড়া দিতেই শ্রুতিকটু শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি।

শেখর দাশের গল্পবীক্ষায় প্রত্যেক গল্পই নতুন। 'শব্দের প্রতিচ্ছবি' গল্পটি সম্পূর্ণ অন্য রকমের। গল্প শুরু হয়েছে এইভাবে গল্প বলছি। ফোলো মী। মনে হয় গল্পকার সরাসরি পাঠকের সাথে যোগসূত্র তৈরি করতে চাইল অন্য অবয়বে। এই গল্পে মুখ্য চরিত্র দুইজন— একজন কথক, অন্যজন শ্রোতা। যে কিনা গল্প লেখার থিম খুঁজছে বা বলা যায় নতুন গল্পকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গল্পের উপকরণ অন্যতম প্রধান শিল্পরীতি।

লেখক তিনটি ঘটনার কথকতার বয়ন প্রতিবারই নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। গল্পকারের গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়, প্রচণ্ড সংবেদনশীল অভিজ্ঞতায় নিজস্ব ভাষা-ভাবনার সাংকেতিক দ্যোতনার অধিক্ষেত্রগুলি নিরন্তর আভাসিত হয়। আর আখ্যান-বয়নে, আদান-প্রদানের যোগসূত্র পাঠক ও লেখকের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

বাঙালির জীবনদৃষ্টির জীবনের বাস্তবতাকে সৃষ্টি গল্পের আকরণ। গল্পের বয়ান শুরু হয় ১৯৪০ এ সিলেট থেকে সুরমাশেল ঝুলন্ত ব্যক্তিকে ট্রেনের তলা

পড়ে যাবার আশংকায় তুলে আনা হল। কিছু পরে স্টেশনে গরীব জীর্ণ পরিবার উঠতে চাইলে প্রত্যক্ষভাবে কেউ বাধা দিল না, সদ্য উপকৃত ব্যক্তি পরোপকারের নজিরটুকু ভুলে গিয়ে আধিপত্যের মনুষ্যত্বহীনতায় অবয়ব জেগে উঠে।

দ্বিতীয় ঘটনা শুরু হয় বাসে শিলং যাত্রায়। মানুষের সহজাত আচরণ মায়া-প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা পূর্ণ হৃদয়। সময়ের অন্ধকারের হাতছানি মানুষ দিনদিন পশ্য করে তুলেছে, উপনিবেশিক শোষণের জাতাকলে। অনাথ পাঁচ বছরের শিশুর কান্নায় লেখকের মায়ায় দশ পয়সায় সাহায্যের হাত বাড়াতেই না বাড়াতে বয়সে বড় অন্য একটি ছেলে ছিনতাই করে নেয়। এই আখ্যানেও আমরা সমাজের শ্রেণিবিভাজনের পাশাপাশি তার মধ্যে নানান জীবন সমস্যার চিত্র দেখতে পাই।

তৃতীয় আখ্যানে কথক চিন্টু নামকরণে মিষ্টির দোকানে ব্যগ্র চোখে মিষ্টি সামগ্রীর দিকে চেয়ে আছে আর লক্ষ্য করছে আলমিরার একটু ফাঁকে পাঁচটা মাছি ভিতরে ঢুকে উড়ছে, চাটছে আর খাচ্ছে। শেষ অবদি প্রচণ্ড আক্রোশে ঢিল মেরে কাঁচ ভেঙে ফেলেছে।

কথকের তিনটি আখ্যানের বিভিন্ন বিকল্প ধরন আর সেই সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার বহুমাত্রিক সমস্যাদীর্ণ জীবনের ছবি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভ্রম শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কথকার আমরা আপাত খালি চোখে যা দেখি— তা ভুলও হতে পারে। এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকে অন্য সত্য ভ্রষ্টা চক্ষু ছাড়া উদঘাটন করা যায় না। মিখায়েল বাখতিন যেন ধারাবাহিক উন্মোচনে চক্ষুষ্মান হওয়াকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি কথক ধারাবাহিক আখ্যান বয়ানে পাঠকে শব্দের ভিতর লুকিয়ে থাকা সত্যের প্রতিচ্ছবি অনুধাবন করার জন্য আর্তি জানিয়েছেন।

গল্পকারের ব্যক্তিসত্তা গভীর উপলব্ধির নির্যাস নিয়ে উঠে আসে বাচন,

গল্পচ্ছলে তিনি যে একটা গল্প লিখেছিলেন এবং হারিয়ে যায় সময়ের অতল গহ্বরে। হারিয়ে যাওয়ার গল্পের বার্তা পাঠকের মহলে সংযোগ স্থাপনে সময়ের বার্তা নিয়ে যায় অন্য পরিসরে। আর গল্পটা ছিল, অসুস্থ মেয়ের। শব্দে বয়ানে গল্পের আবেদন সরাসরি পাঠককে কৌতুহলী এবং মর্মবিদ্ধ করে 'মারা গেছে আজ কুড়ি বছর'।

'মানুষের মনটা চিন্তার খনি', 'অসুখ শব্দটা যত ভয়ঙ্কর তত রোমাণ্টিক', 'ভালবাসায় বড় বেশী কারুকাজ', বা 'আলোয় আগুন আছে না, জ্বালাবেই তো!' — চিন্তাকল্প বিচিত্র ভাবনার বহুরৈখিক সৃজনতত্ত্ব প্রক্রিয়া গল্পকারের অতুলনীয় শব্দশিল্প। ভাষা-বর্ণে পাঠকের স্বপ্নিল ভূবন-তাৎপর্য আমূল পালটে দেওয়ার প্রয়াস গল্পভাষায়। জীবনের পথ ও প্রক্রিয়া যেহেতু সহজ নয়, গল্পকারের বয়ানে ব্রেতোঁ কথিত সেই **'Swinging door'** এর তাৎপর্য ফুটে উঠে।

লেখকের বয়ানে ব্যক্তিসত্তার আবেগ, অভিমান সময়ের কঠিন কষ্টিপাথরে চেতনার পূর্ণ প্রকাশ কিন্তু কর্ম অনুযায়ী আশাতীত ফল লাভে ব্যর্থ ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণতি লাভ করে।

> *"আমার ডায়রীটা, বললাম না, বোঝাই এক্কেবারে।*
> *... আসলে আমার যা আছে, দুঃখ বলো সুখ বলো,*
> *জ্বালা বলো, হাসি কান্না সংসার যাই বলো না*
> *কেন, সবকিছুর উত্তরাধিকার অগ্নি মানে আগুন,*
> *আগুন! আগুনে উত্তাপ আছে না! ডায়রীটা নেই,*
> *অনেক আগেই পুড়িয়ে ফেলেছি।"*[৪৩]

শেখর দাশের গল্পে ব্যথিত রূপকের আড়ালে ব্যক্ত হয় গভীর সত্যের প্রতিবেদন, যা আমাদের বিদ্ধ করে। বাইরে থেকে শূন্য দৃষ্টি দিয়ে এই সত্য দেখা

যায় না, তারজন্য প্রয়োজন হয়, 'দ্রষ্টাচক্ষু'র গভীর উপলব্ধি।

গল্পজগতের 'ডায়নোসোরের ফুসফুস' গল্প বয়ানে জীবনের বহুমাত্রিকার সময় ও পরিসরের যুগলবন্দি রূপ শিল্প চেতনার অনবদ্য রূপান্তর। শেখর দাশের গল্পভাবনায় বাংলা সাহিত্যের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার অন্ধকার জগত পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন ব্যতিক্রমি পথের আলোয়। গল্পের শুরুতে রতীশ আর তার স্ত্রীর জীবনের নিবিড়তর মুহূর্তের চিত্রকল্পের মাধ্যমে। গল্পে সত্য ও স্বপ্নের জগৎ মিলেমিশে রতীশ শুধু জীবনকে বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

জীবনের বহুবিচিত্র এক চিত্রশালার নানা রঙ ও রূপের ছবি শেখর দাশ নিচুশ্রেণি মানুষের চরিত্রের ও জীবনের ছবি অঙ্কন করেছেন। 'ডায়নাসোরের ফুসফুস' গল্পে রতীশ ও পূরবী উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের মধ্যে অন্তসার হয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধি। নামকরণেও তাৎপর্যময় দ্যোতনা। 'ডাইনাসোর' যেমন বিশ্বে অবলুপ্ত, তেমনি উচ্চ-মধ্য সমাজের মানুষের মানবিকবোধও অবলুপ্ত। কারণ তারা দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্টের ইতিহাসই জানে শুধু; কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ানোর হৃদয় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কারণ যান্ত্রিকযুগে তারা শুধু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।

প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, অন্তরে ও বাইরে নিরন্তর বয়ে যাওয়া ব্যক্তিসত্তা আবিষ্কার করে নেয় তাঁর সৃজন শক্তিকে৷ আর গল্পকারের বয়ানে সমাজের অস্তিত্বের সংকট স্বচ্ছ ও পরিশীলিত ধারণা পাঠকের কাছে তুলে ধরে। 'ডায়নাসোরের ফুসফুস' শেখর দাসের পুরোপুরি ভিন্ন গোত্রের ছোটগল্প। আধুনিকতাবাদী বীক্ষণে সময়ের নির্মিতি কিভাবে একটা গোটা মানুষের চিন্তা-ভাবনার-স্বাদ পাল্টে যায় তাই দেখানো হয়েছে। নিপীড়িত-সর্বহারার মানুষের

টুকরো ছবির অভিজ্ঞতা নিয়ে রতীশের ভাবনাবিশ্ব। সে বুঝে কিছু সে উচ্চ-মধ্যবিত্ত জগতের মানুষ। দূর থেকে দেখে অসহায় নিচুতলার মানুষের প্রান্তিক জীবন। প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা আমরা দেখি না। তা আসলে অবলুপ্ত মানবিকবোধ ক্ষয়ে যাচ্ছে উচ্চবিত্ত মানুষের জীবন থেকে।

লেখকসত্তার প্রবল সংবেদনশীল স্পর্শে কাতর হয়ে উঠে, উপেক্ষিত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের কষ্টদায়ক জীবন প্রণালী চিত্র দেখে। আমাদের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ে সেই অন্ধকার সমাজের সময়ের কৃষ্ণবিবর—

"অন্ধকার ছিলাম, অন্ধকার আছি, অন্ধকার হব।"

রতীশের ভাবনাবিশ্ব অন্ধকার প্রজন্মের প্রতিনিধিই শুধু ঘর থেকে ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে অন্ধকার জীবনের প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী জ্বালার চিন্তাই পাঠকৃতির সঞ্চালক।

ভাবুক রতীশ শুধু প্রান্তিকায়িত মানুষের দুঃখ-কষ্টের বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা ও শোনা। প্রত্যক্ষ, নিপীড়িত অস্তিত্বের সংকটময় জীবনে তাঁর কোন ভূমিকা নেই—

"ব্যালকনির ডানদিকে একটু দূরে, ছোট্ট বস্তি আছে।
রতীশ রোজ ঐ বস্তি দেখে। তার বাইনোকিউলার
আছে। বাইলোকিউলারে চোখ রেখে ওপর থেকে
নীচের বস্তি দেখা রতীশের গোপন সৌখিনতা।"[৪৪]

সে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ও সমাজ দেখে কিন্তু সেই সমাজে থাকে না। তাঁদের দুঃখ-কষ্ট শুধু গোপন সৌখিনতায় আবিষ্কার করে মাত্র।

সুতরাং এই গল্পভাবনায় লেখকসত্তার নিচুশ্রেণি মানুষের জীবনবোধ আকৃষ্ট করে সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মনের গভীরে চেতন-অবচেতন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ছবি লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে।

তদুপরি লেখকসত্তার বয়ানে সামাজিক পরিসরে ও সামূহিক নিরিখে ভারসাম্যের অভাব বহুস্বরিক দ্যোতনায় ব্যক্ত হয়—

> *"সুদৃশ্য ষ্টিরিও সেটে সকাল বিকাল রবীন্দ্রনাথ জন্মান ও মরেন। একটানা গান শোনে তারা, 'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।"*[৪৫]

বাস্তবের স্থবিরতা থেকে অধিবাস্তবের আশ্চর্য নতুন মাত্রা উত্তীর্ণ ব্যক্তিসত্তার অর্ন্তসার শূন্যতাকে খুঁজে ফেরে নিরাবেগ হৃদয়। যা প্রতিফলিত হবে নিঃসহ মানবজীবনের দৃষ্টি-গোচর নিঃসম্পর্কের গ্রন্থনায়। কথকের দাম্পত্য জীবনগাঁথা ও খুব বেশি সুখের নয় স্ত্রী পূরবীকে নিয়ে। আসলে বৈচিত্র্যহীন যান্ত্রিক ছকে বাঁধা রতীশ অনুভব করে সম্পর্কহীনতা। তাদের শরীর সান্নিধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্তার অস্তিত্ব থাকলেও নিঃসঙ্গতা বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে। কারণ মানবিকবোধ লুপ্ত মানুষের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসাও শুকিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

> *"স্ত্রী ওর পাশে বসে। ডান হাত রতীশের পিঠে বুলোয়। বলল,*
> *— তখন থেকেই তোমাকে ভাল লাগত রতীশ*
> *— হুম। আমি বাসিনা।*
> *— তো আর একসাথে ওঠাবসা কেন।*
> *— তোমাকে বিয়ে করেছি, তাই*
> *— তাতে কি*
> *— মর্য্যাদা"*[৪৬]

বয়স্ক মহিলার বিপন্ন হাসি, দেয়াল লিখন সমাজে বিভিন্ন প্রান্তে গল্পকার দরিদ্রদের ক্লান্ত জীবন খুঁড়ে খুঁড়ে খায়। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসের মাদকতায় অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না—

> *"ছেঁড়া পেটিকোট পরা প্রায় নগ্ন স্ত্রীলোক, কোলের বাচ্চা ও নিজেকে খাওয়ায়। জলে ভেজা বাসি ভাত। লোহার কড়াই নিয়ে বসেছে। ক্রমশ কড়াই দখল করছে আরো চার পাঁচটা বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা। দূরের ক্ষুধার্থ কুকুর তাদের খাওয়া দেখছে। একটু পরই ডাইভ করে নামলো একটা কাক। ... কুকুরটা তাদের বিপর্যয়ের সুযোগ নিল।"*[৪৭]

গল্পের বয়ান নতুন নতুন সৃষ্টিচেতনা, শিল্প মাধ্যমে পাঠকমহলের অন্তরে অন্তত দুর্বল শোষিত ঝাপসা ও অনিশ্চিত জীবনবোধের দাগ কাটে। হয়তো টুকরো টুকরো বাইনোকিউলারে দূর থেকে সম্পূর্ণ নিচুতলার মানুষের জীবনযন্ত্রণা-বোধ দেখা অসম্ভব। পাওয়া-না পাওয়ার নিঃসঙ্গতাবোধ রতীশকে ভালোবাসার খোলসের আবর্তে অবচেতন মনে খুঁজে বেড়ায়। রুণিমাকে ধরা ছোঁয়ার গন্ডির বাইরে একটা জগৎ আছে—সে হলো অন্যজগৎ সম্পূর্ণ নিজস্ব অবয়বে অর্ন্তমুখী জগৎ। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে বিমল কর ছোটগল্পের অর্ন্তমুখিনতায় বলেছেন—

> *"আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বর্হিঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে অন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি— একথা অস্বীকার করা যায় না ...*

ছোটগল্পের ও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।"[৪৮]

সেই একাকীত্বের ঘ্রাণ, ঝাপসা, কষ্ট, যন্ত্রণাময় শোকেও রতীশকে নিয়ে যায় রোমান্সের জগতে, সমাজ-সংসারের এমন নির্মম চিত্র দেখে ইটের দেয়াল ভেঙে আর্তনাদ করে লেখকসত্তার। স্মৃতি ও বিবেকের নিসর্গের চিহ্নায়ণে পুঁজিবাদ লালিত আধুনিকতায় ব্যক্তির স্খলন পতন অনিবার্যই—

"মোমবাতির মাথায় নিঃসঙ্গ চাঁপাফুল, আর ঘরের সমস্ত দেয়াল জুড়ে কাঁপছে রতীশের ছায়া।"[৪৯]

'শতক্রতু' ২৫তম সংখ্যায়, চৈত্র ১৩৮৮ বাংলা, শেখর দাশের 'মৃতবৎসা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'মৃতবৎসা' ভাষায়, দক্ষতায় আকরণে পাঠকের হৃদয়ের কাছে আবেদন জানায়, জীবনে অন্ধকারে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ সহস্র দুঃখ-যন্ত্রণা সঙ্গে বসবাস। তার মধ্যে অদৃশ্য লুকিয়ে থাকা অনেক ক্ষত অত্যাচার শব্দহীন হয়ে শুধু বাতাসের বেগ বাড়িয়ে তোলে। নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের যন্ত্রণার কাহিনি নিয়ে গল্প। গল্পবীক্ষা ও গল্পভাষা যুগপৎ দারিদ্র প্রান্তকায়িত ব্যক্তিস্বর সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত। গল্পকার প্রান্তিকায়িত পরিসর ও অস্তিত্বের ছবি আমাদের অজ্ঞাতসারে মনুষ্যত্বের অন্ধকারের অভিজ্ঞান কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন মেরুর প্রতিনিধিত্ব করছে গল্পবীক্ষায় তা লক্ষিত হয়।

"— পান খাবে তো খাও। আর ঐ দেখো তোমার গ্লাস। ওতে জল খাবে। তখন নারকেলের ঠালিতে জল খেয়েছ। — গেলাস লাগে না। আমরা ওতেই জল চা সব খাই। গরম হয় না। ভাবে না।"[৫০]

নিম্নবর্গীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, হাসি, কষ্টের অব্যক্ত করুণনির্বাক চাহনি, তাদের আচার-ব্যবহার গল্পকার যেন জীবন্ত একটা মানুষের বুকচাপা ব্যক্তিত্বের কারুকার্যময় আদল গড়ে তুলেছেন— জগার মায়ের মধ্যে।

জগার মায়ের নির্দিষ্ট কোন নামকরণ না করে গল্পকার সমগ্র দরিদ্রশ্রেণির নারীজাতির বেদনাকেই তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ ঘটতে থাকায় দরিদ্রমানুষের অজস্র রূপান্তর হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য পণ্যায়নে ও ঔপনিবেশিক পরিসরে নিম্নশ্রেণির মানুষের পথ এবং গন্তব্যের অনন্বয়ে সর্বব্যপ্ত ভাঙনের মুখোমুখি হয়। ত্রিশ বছর আগের গল্পকার এই গল্পে নারীর অর্ন্তসত্তার মূল দুইটি দিক তুলে ধরেছেন। একদিকে সন্তান হারানোর শাশ্বত দুঃখ, অন্যদিক নারীর সর্বহারানোর হাহাকার বেদনা। সব মিলেমিশে জগার মা থেকে গল্পকার লোচনের বউয়ের শীলতাহানি সমাজের বর্বর পশুর তান্ডবলীলাই সাক্ষ্য দেয়। নির্দিষ্ট কোন আকরণে না বেধে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লুণ্ঠিত অত্যাচারিত নারী মূর্তি গড়ে তুলেছেন যা হৃদয়বিদারক।

নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বপ্ন-আশা-লক্ষ্য হয়তো বা জীবন দিয়ে অদৃষ্টের লেখা লেখতে হয়। পড়াশুনার জন্য জগার অর্থ উপার্জনের জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিয়তির হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।

নিম্নশ্রেণি মানুষের চিরকালীন জ্বলন্ত সময়ের ঔপনিবেশিক প্রতাপে সর্বহারার কোন স্থান নেই। সামন্তবাদী শোষক কখনও পুঁজিবাদী আধিপত্যপন্থী প্রতাপ গরীবের মুখের গ্রাস কেঁড়ে নেয়। ভৃগু, জগার জেঠা, মহাজন সময় ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনও জগার মাকে কখনও লোচনের বউকে পায়ে দলিয়ে সর্বহারার সময় ও পরিসর জুড়ে অব্যাহত থাকে শোষণের আবর্তন। সোনার দেশ ত্যাগ করে বাঁচার ক্ষীণতম আশায় আশ্রয় নেওয়া মানুষের জীবনের

হাহাকার যন্ত্রণা প্রবল সংবেদনশীল গল্পকার তাদের স্বর পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চায় গল্পবয়ানে।

শতবাধা বিপত্তি এড়িয়ে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে নবপর্যায় 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রীস্টাব্দে। এই লিটল ম্যাগের আবিষ্কার শেখর দাশের সময় ও পরিসরের 'পরিব্রজন' গল্পে এমনভাবে বিধৃত হয়েছে যা সমকালীনতার দাবি মিটিয়ে ভবিষ্যত দ্রষ্টার তাগিদ অনুভব করা যায়। আরও একটা আক্ষেপ মনের ভিতর গভীর শোকের ছায়া শুধু প্রশ্নের আকারে পাঠকের কাছে উঁকি মারে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর প্রকাশহীন না থেকে যদি 'শতক্রতু' ধারাবাহিকতার প্রকাশ হতো তাহলে বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক দিক্ উন্মোচন হতে পারত৷ নব পর্যায়ে শতক্রতুর প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এবং পাঠক মহলে পঠন-পাঠন ও সংস্কৃতির চর্চার পথ উন্মোচন করে হৃদয়ের সাড়া জাগালো। সম্পাদকীয় লেখাতে খুব সত্যি কথা লিখেছেন— 'নবপর্যায় 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর প্রকাশহীন থাকার পরও যখন গতবছর (আষাঢ় ১৪১৫ বাংলা) পুনঃপ্রস্তাবনা সংখ্যা প্রকাশিত হল তখন 'শতক্রতু'র দূর ও কাছের লেখক ও পাঠকবর্গের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে তা একটি লিটল ম্যাগের পক্ষে অতি আনন্দদায়ক ঘটনা। মাঝের দীর্ঘ বছরগুলোতে 'শতক্রতু' প্রকাশ বন্ধ থাকলেও পাঠকমনের অমলিন স্মৃতি সম্পাদকদ্বয় এবং অন্যান্য নিষ্ঠাবান কর্মীদের যার পর নাই বিস্মিত করেছে। এবং নবপর্যায় শতক্রতু প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক ও অবক্ষয়ী আধুনিকতার অবস্থানে দাঁড়িয়ে সত্য আড়াল করে সুবিধাবাদী পণ্যবিজ্ঞাপনে জীবন-যাপন অদ্ভুত জটিলতায় আক্রান্ত করেছে। উন্নত থেকে উন্নতর জীবন যাপন সর্বগ্রাসীর কৃৎকৌশলে মানুষের অস্তিত্ব বিপর্যয়ে চাকচিক্যের বিশ্বে স্থূলচোখে তা দেখতে

পায় না। আর এই জটিল সময়ের হাতছানি বিশ্বায়ন-নব্যবুদ্ধি, উপনিবেশোত্তর চেতনায় অন্তর্বয়ন, রাজনৈতিক সমাজের দ্বারা ব্যবহৃত প্রতাপের নানা কৃৎকৌশল বাংলা গল্পে সর্বতোভাবে অনেকর্থদ্যোতক সমাবেশ লক্ষ করি।

শেখর দাশে 'পরিব্রজন' গল্পভাষার মধ্যে আধুনিকতার সংকট ও উত্তরণ প্রয়াস সন্ধানে— আমরা দেখতে পাই বিচিত্র অভিব্যক্তি। গল্পকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় সমকালীন বাস্তব অনেকটাই ব্যতিক্রম। সময় ও সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দবোধ লেখকের চিন্তাবিশ্বে আধুনিকতার বিপন্ন সময়ের ধ্বংসের উপলব্ধি ও তার উত্তরণ প্রয়াস আমাদেরও ভাবিয়ে তোলে ভবিষ্যত দ্রষ্টা হতে।

গল্পের প্রথমে চিরশাশ্বত প্রেম ও মনের গভীরতম প্রদেশে চিরন্তন আকূতি কথকের সাক্ষাতে রূপময় সুনয়নার নিবিড়তর আক্ষেপ—

> *"কুড়ি বছর আগে দেখা যদি হত দুজনে? এতদিন*
> *কোথায় ছিলে তুমি?"* [৫১]

মানুষের জটিলতম জীবনে প্রেম-ভালোবাসার উর্ধ্বে স্বার্থন্বেষী মানুষ প্রতিযোগিতার দৌড়ে শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার মেশিনে পরিণত হচ্ছে। তবুও সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ প্রতিযোগিতামূলক দৌড়-ঝাপের মধ্যেও একটা সময় প্রকৃত-ভালোবাসার জন্য কাঁদে। জটিল সময়ে দাঁড়িয়ে লেখকের লেখনীতে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বিবাচনিক সম্পর্কের বিষয়টি অনায়াসে পাঠকের কাছে উঠে আসে।

'বাতাস ও গুটিকয়েক মানুষ ভবঘুরে থেকে যায় চিরকাল' স্বভাবের মালাবার হিলে তেতাল্লিশ দিনের পরিচয়ে চল্লিশ বছর বয়সে সুনয়নার সাথে আটচল্লিশ বছরের বক্তার অবচেতন মনে খুঁজে ফিরে জীবনানন্দের বনলতা

সেনকে।

প্রচণ্ড সংবেদনশীল কথক দেশ-সমাজের টেকনোলজি যুগে দাঁড়িয়ে মহা বিপন্ন সময়ে মেয়েদের অস্তিত্বে সন্দিহান। লাভ ও খ্যাতির আধিপত্য প্রতিযোগিতার বাণিজ্যে লোভাতুর লালসা পুঁজিবাদী নারীকে পণ্যজাত নগ্ন ভোগ সামগ্রী সমতুল্য করে তুলে।

> *"এখন কি সবকিছু নিরাবরণ বা বিবস্ত্রীকরণের টেকনোলজি? আর অস্থির মস্তিষ্কের বাজার অর্থনীতি? সেনসেক্স ইনডেক্স, সুদূরের ওয়াল স্ট্রিট, এখানে দালাল স্ট্রিট। সবখানেই একই কুচকাওয়াজ— হর মোর্চে মে বিলকুল নাঙ্গা যানা হ্যায়।"*[৫২]

বক্তার বিবেক আর অস্তিত্ব জেগে ওঠে যখন, দ্বিবাচনিক দর্পণের উদ্ভাসন ঘটে। কথকের ব্যক্তিগত ও সামূহিক পরিসর জুড়ে ভঙ্গুর সমাজের আধিপত্য প্রতাপের শোচনীয় নিরন্তন দৃশ্য অধিকার করে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ করি কথকের প্রতিবেদনে সর্বগ্রাসী টেকনোলজির বাণিজ্যের রমরমার জন্য মানুষের অনুভূতি শূন্য করে তুলেছে। ধ্বংসের হাতছানি মানুষকে অবিশ্বাস ও দিশাহীন করে রেখেছে— তাই কথকের উদার ও সহানুভূতির সাহায্যের হাত ভোগ্যপণ্যসর্বস্ব বিশ্বায়নের ক্ষয়বিকার অবসাদে মেট্রোপলিসে শ্যু-শাইন-গার্ল উঠে আসে 'গান্ধা আদমী' ও 'একমুখ থুথু' ছিটিয়ে সরে গেল সর্বগ্রাসী ভিড়ে। লেখকের মনের অভিব্যক্তি ও সামাজিক সত্তার দ্বিবাচনিকতায় গল্পে প্রতিবেদনে অন্তস্বর ভেসে ওঠে। সময় ও সমাজের রৈখিকতা উর্ধে লেখকসত্তা খুঁজে ফিরে শ্বাশত ও চিরন্তনী সমাধানের সন্ধানে—

> *"ওকে দিতে চেয়েছিলাম শাশ্বত, চির-নিরাপদ এক*

আবরণী। যা ছোটো হয় না, ছেঁড়ে না কোনোদিন। শত চেষ্টায় ও টেনে খুলতে পারে না কেউ— কঠিন বর্মের মতন পরিধেয় দেওয়ার কথা ছিল রে পাগলি। ধিক্কার দিলি! তোর দোষ নেই। কতদিকে কত মেয়ের দল কতই না অসহায়।”[৫৩]

দেশ ও সমাজে বিপণন— নগরীর লোভাতুর লম্বা হাত, জীবন ও জীবিকায় অস্থির সময়ের বিচিত্র নগ্ন শরীরের প্রদর্শনীতে অসহায় মেয়েদের ‘শিকার চিরকালই অসহায়’ সুযোগে ট্রেডাররা মুনাফা লুটে।

মেগা সিটির শ্যু-শাইন-গার্ল বিপন্ন জীবন কাহিনি কথকের চিন্তাবিশ্বে ও মননে আধুনিকতার চোখধাঁধানো মনভোলানো আকল্পে দিনের আলোয় ‘অন্য এক আঁধার’ গ্রাস করে। আদিকাল থেকে নারীর শোষণ ও ব্যবহার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ করে আসছে, একবিংশ শতাব্দিতে দাড়িয়ে আধুনিকতার মুখোশ পরে শুধু পাল্টানো হয়েছে। নারীকে একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রয়োগ করে পিতৃতন্ত্র চিরকাল আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। আমরা এই গল্পে কথকের স্বরে শুধু জীবিকার তাগিদে মেয়েদের বিপন্ন জীবনের বন্দিত্ব; এটাও আসলে সমাজ নির্মিত। আর সমাজ যখন অচলায়তনে পরিণত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে জীবনের আধার জটিলতর হয়ে যায়। ‘পরিব্রজন’ গল্পে লেখকসত্তা আধুনিকতার মুখোশ নিয়ে বিভিন্ন জীবিকায় পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ নারীদের শারীরিক মানসিক যন্ত্রণার স্বর আবিষ্কার করে।

কথকের চোখের সামনে ধ্বংসের, যন্ত্রণার অসুখের নরকপুরী সমাজের যাবতীয় চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও সুন্দর পৃথিবীর খুঁজে নিজেকে পরাধীন পেয়েছেন। আসলে এই অসহায়বোধ লেখকসত্তার। কালো লম্বা আধুনিকতার নেশা মানুষকে

মোহিত করে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। বিপণন বাণিজ্যের লোভাতুর লালসা কালো হাতকে শোষিত কিশোরী ধিক্কার লেখক-পাঠক আর আত্মকেন্দ্রিক পৃথিবীর বুকে। আমাদের মনে পড়ে জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন—

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"[৫৪]

এই গল্পে লেখকসত্তা মানবিক প্রবল আবেগ সূত্রে আজকের দিনে আমাদের যে জনজাগরণ ভিতরে ও বাহিরে শুরু হয়েছে— তা তিনি ২০০৯ সালে অর্ন্তবয়ন কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন—

"গোলি মারো লেখার কপালে। কলম না, একটা বিপুল ঝাড়ু চাই হাজার হাজার বছরের স্তরীভূত ও রূপান্তরিত আবর্জনা সরাতে। অ্যান অ্যাক্সটনসিভ সুইপিং। এখানে সব কিছুই বর্জ্য।"[৫৫]

সময়ের দ্বিবাচনিকতায় গল্পের আকল্পে বহুস্বরিত ও অনেকার্থকদ্যোতনা পাঠক মহলে অসম্ভব অসহনীয় পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই যেন লেখকের বয়ান তৈরি হয়েছে।

জীবনের গভীরতম তীক্ষ্ণতা নিয়ে জীবনের আরাম-আয়েস, সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে ভালোবাসার আশ্রয় থেকে নিরাশ্রয়ের পথ লেখসত্তাকে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। ছুটে চলে ভিন্ন আখ্যানে যেখানে কথক আর লেখক মিলেমিশে এক হয়ে রূপান্তরিত হয় চিরশাশ্বত সুখ-শান্তির আশ্রয়ে। এইভাবে পৃথিবীর গভীরতর অসুখের সমাধানে লেখকসত্তার আর্তি খুঁজে ফিরে প্রকৃতি শৈশব অবলীলার কাছে দূর থেকে দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে।

তথ্যসূত্র :

১. সম্পাদকীয়, শতক্রতু, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ বাংলা

২. ভূমিকা, বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, অক্টোবর, ১৯৬৩, পৃঃ ৫

৩. সম্পাদকীয়, শতক্রতু, প্রথম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, মহালয়া ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ২

৪. সম্পাদকীয়, শতক্রতু, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৮১ বাংলা

৫. বিজ্ঞাপন, শতক্রতু, ২৫, চৈত্র, ১৩৮৮ বাংলা

৬. শতক্রতু, তৃতীয় বর্ষ, ২ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৮২ বাংলা

৭. বিজ্ঞাপন, শতক্রতু, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জন্মাষ্ঠমী ১৩৮০ বাংলা

৮. শতক্রতু, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮২ বাংলা

৯. সম্পাদকীয়, শতক্রতু, নবপর্যায় প্রথম প্রকাশ, শরৎ ১৪১৬ বাংলা

১০. তদেব

১১. ছোটগল্পের বিনির্মাণ, তপোধীর ভট্টাচার্য, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃঃ ৪১

১২. ক্রমশ তাপ, শেখর দাশ, শতক্রতু, প্রস্তাবনা সংখ্যা, রথযাত্রা, আষাঢ়, ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ৯

১৩. তদেব, পৃঃ ১১

১৪. শ্বেত রক্ত কণা, শেখর দাশ, শতক্রতু, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জন্মাষ্ঠমী, ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ৩

১৫. তদেব, পৃঃ ৪

১৬. খেলার ঘর, শেখর দাশ, শতক্রতু, প্রথম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, মহালয়া, ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ৫

১৭. তদেব, পৃঃ ১০

১৮. তদেব, পৃঃ ১৪

১৯. ভিক্ষুক, শেখর দাশ, শতক্রতু, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রথযাত্রা, ১৩৮১ বাংলা, পৃঃ ১

২০. তদেব, পৃঃ ২

২১. তদেব, পৃঃ ৯

২২. তদন্ত, শেখর দাশ, শতক্রতু, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮১ বাংলা, পৃঃ ৩৩

২৩. তদেব, পৃঃ ৩২

২৪. তদেব, পৃঃ ৩৪

২৫. তদেব, পৃঃ ৩৬

২৬. তদেব, পৃঃ ৩৬

২৭. আপাৎকালীন, শেখর দাশ, শতক্রতু, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ বাংলা, পৃঃ ২

২৮. তদেব, পৃঃ ৩

২৯. তদেব, পৃঃ ৫

৩০. তদেব, পৃঃ ৭

৩১. জোড়শালিক, শেখর দাশ, শতক্রতু, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৮১ বাংলা, পৃঃ ১৮

৩২. তদেব, পৃঃ ২১

৩৩. ফেরারী, শেখর দাশ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২ বাংলা, পৃঃ ৫

৩৪. তদেব, পৃঃ ৫

৩৫. তদেব, পৃঃ ৭

৩৬. তদেব, পৃঃ ১৮

৩৭. আসন্ন বিকেলের শেষে, শেখর দাশ, শতক্রতু, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮২ বাংলা, পৃঃ ২০

৩৮. তদেব, পৃঃ ২২

৩৯. তদেব, পৃঃ ২৮

৪০. তদেব, পৃঃ ২৮

৪১. তদেব, পৃঃ ৩১

৪২. তদেব, পৃঃ ৩৩

৪৩. শব্দের প্রতিচ্ছবি, শেখর দাশ, শতক্রতু, তৃতীয় বর্ষ, সংকলন, ৪-৬ ফাল্গুন, ১৩৮২ বাংলা, পৃঃ ৬২

৪৪. ডায়নোসোরের ফুসফুস, শেখর দাশ, শতক্রতু, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, দীপাবলী ১৩৮৫ বাংলা, পৃঃ ১৮

৪৫. তদেব, পৃঃ ১৯

৪৬. তদেব, পৃঃ ২২

৪৭. তদেব, পৃঃ ২৪

৪৮. তদেব, পৃঃ ২৫

৪৯. মৃতবৎসা, শেখর দাশ, শতক্রতু, ২৫তম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৮৮ বাংলা, পৃঃ ৬০

৫০. পরিব্রজন, শেখর দাশ, শতক্রতু, নব পর্যায়, প্রথম প্রকাশ, শরৎ ১৪১৬ বাংলা, পৃঃ ১৪০

৫১. তদেব, পৃঃ ১৪২

৫২. তদেব, পৃঃ ১৪৩

৫৩. তদেব, পৃঃ ১৪৬

৫৪. তদেব, পৃঃ ১৪৭

৫৫. তদেব, পৃঃ